ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana™ SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬২ বর্ষ ৯ সংখ্যা ।। ৮ কার্তিক, ১৪১৬ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১১) ২৬ অক্টোবর, ২০০৯ ।। Website : www.eswastika.com

অনুপ্রবেশ নিয়ে টনক নড়ল কেন্দ্রের

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরা যখন হাজারে নয়, লাখে লাখে উত্তর-পূর্বাঞ্চল সহ সারা দেশে ভরে গিয়েছে, দেশের মোট জনসংখ্যার ২

শতাংশে পৌঁছেছে, তখন একটু হলেও টনক নড়েছে কেন্দ্রের। সংখ্যাটা ওয়াকিবহাল মহলের মতে দু'কোটিও বেশি। অসম সরকার গুটি কয়েক আদালত কর্তৃক চিহ্নিত (২৪ হাজার) বাংলাদেশীকে ফেরৎ পাঠাতে ব্যর্থ হওয়ায় কেন্দ্রের দ্বারস্থ হয়। সম্প্রতি এব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক অসম, মিজোরাম, মেঘালয় ও ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বাংলাদেশীদের ফেরৎ পাঠানো নিয়ে আলোচনা করেন। অসম সরকারের স্বরাষ্ট্র-সচিব জিষ্ণু বরুয়া বৈঠকে প্রতিনিধিত্ব করেন। অসম সরকারের বক্তব্য হলো — চিহ্নিত বাংলাদেশীদের বহিষ্কার করতে চাইলেও বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বি ডি আর তাদের ফেরৎ নিতে রাজী হচ্ছে

(এরপর ৪ পাতায়)

নন্দীগ্রামের খেলাই লালগড়ে খেলছেন বুদ্ধ

গূঢ়পুরুষ ।। সাংবাদিকদের এখন লালগড়ে প্রবেশ নিষিদ্ধ। সাংবাদিকের ছদ্মবেশে গোয়েন্দা পুলিশ ছত্রধর মাহাতোকে গ্রেফতার করার পরেই গণমাধ্যমের প্রতিনিধিদের জঙ্গলমহলে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। সরকারিভাবে বলা হচ্ছে সাংবাদিকদের সুরক্ষার জন্যই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। পুলিশের চর সন্দেহে মাওবাদীরা সাংবাদিকদের উপর প্রতিহিংসা নিতে পারে। এর নিট ফল, ছত্রধরের গ্রেফতারের পর লালগড় সহ জঙ্গলমহলের আদিবাসীদের উপর কতটা নির্যাতন চলছে অথবা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস কতটা নির্মমভাবে নেমে এসেছে জানা যাচ্ছে না। একটা কথা ভুললে চলবে না যে মাওবাদী এবং মার্কসবাদী উভয়পক্ষই হিংসার রাজনীতিতে বিশ্বাসী। বিপ্লবী ও অতি বিপ্লবী কম্যুনিস্টরা আদতে মার্কসীয় তত্ত্বের উপরেই তাদের রাজনৈতিক আদর্শ গড়েছে। লেনিনবাদী, মাওবাদী, মার্কসবাদীরা সংসদীয় গণতন্ত্রে আস্থা রাখে না। মার্কসীয় তত্ত্বে সংসদীয় গণতন্ত্রের কোনও অস্তিত্ব নেই। এই তত্ত্বে যা আছে তা হলো ছলে-বলে কৌশলে রাজনৈতিক শত্রুদের খতম করা। ঠিক যে কাজটি এখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় বলীয়ান সিপিএম পশ্চিমবঙ্গে করছে। শুধু জঙ্গলমহলই নয় সারা রাজ্যজুড়ে এখন এক ভয়াবহ সন্ত্রাসরাজ কায়েম করা হয়েছে। কম্যুনিস্টদের একটাই নীতি, হয় দলদাস হও নয় মরার জন্য প্রস্তুত হও। এই একটি ব্যাপারে মাওবাদী, লেনিনবাদী, স্তালিনবাদী, মার্কসবাদী সব রঙের কম্যুনিস্টরাই একমত। জনগণকে আজ্ঞাবাহক দলদাস করাই কম্যুনিস্ট নীতি।

পশ্চিম মেদিনীপুরে মাওবাদীরা সন্ত্রাসরাজ কায়েম করেছে তা মেনে নিলে সি পি এমকে মানতে হবে তারাই প্রথম হার্মাদ বাহিনী-ঘোষকার বাহিনী কেশপুরে, নন্দীগ্রামে, সিঙ্গুরে নামিয়ে লাল সন্ত্রাস কায়েম করেছিল। মাওবাদীরা সেই সন্ত্রাসের ছিদ্রপথে জঙ্গলমহলে প্রবেশ করেছে। সিপিএম সন্ত্রাস প্রতিরোধের নামে খুনের রাজনীতি চালাচ্ছে। এই দুই লাল সন্ত্রাসের

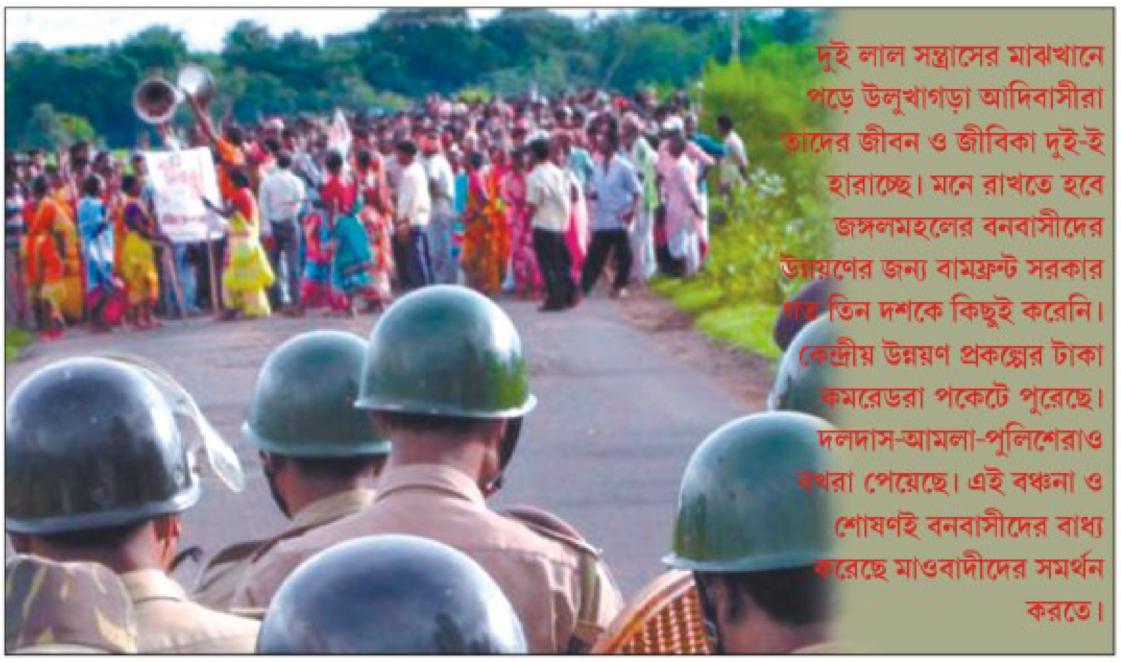

মাঝখানে পড়ে উলুখাগড়া আদিবাসীরা তাদের জীবন ও জীবিকা দুই-ই হারাচ্ছে। মনে রাখতে হবে জঙ্গলমহলের বনবাসীদের উন্নয়ণের জন্য বামফ্রন্ট সরকার গত তিন দশকে কিছুই করেনি। কেন্দ্রীয় উন্নয়ণ প্রকল্পের টাকা কমরেডরা পকেটে পুরেছে। দলদাস-আমলা-পুলিশরাও বখরা পেয়েছে। এই বঞ্চনা ও শোষণই বনবাসীদের বাধ্য করেছে মাওবাদীদের সমর্থন করতে। সত্তরের দশকে পশ্চিমবঙ্গে নকশাল এবং সিপিএম হিংসা ও প্রতিহিংসার রূপকার। উভয়পক্ষই রক্তের হোলি খেলেছিল। বিপ্লবী ও অতি বিপ্লবীয়ানার জাঁতাকলে পড়ে সেই সময় কত তরুণ যুবক অকালে প্রাণ হারিয়েছিল তার হিসাব কেউ রাখেনি। এই রাজ্যে কম্যুনিস্টদের হিংসার রাজনীতি আজও সমানে চলেছে। নন্দীগ্রাম, সিঙ্গুর, মঙ্গলকোট, কেতুগ্রাম, কেশপুর, খানাকুল সর্বত্র নিরপরাধ শান্তিপ্রিয় মানুষ লাল সন্ত্রাসের শিকার।

রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলার দায় বামফ্রন্ট সরকারের। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মশাই রাজ্যের পুলিশ ও প্রশাসনের দায়িত্বে আছেন। তাঁর আমলে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক সন্ত্রাসের বলি যত মানুষ হয়েছে তার দ্বিতীয় নজির নেই। খুনের খতিয়ান পেশ করলে সত্তরের দশকের নৈরাজ্যও হার মানবে। বিগত ৩৫ বছর বা তার বেশি বুদ্ধবাবুকে সাংবাদিকতার সূত্রে কাছ থেকে দেখেছি। তিনি স্তাবকতা পছন্দ করেন। যে সব আই এ এস, আই পি এস আমলা চব্বিশ ঘন্টা স্যার.....স্যার করেন না বুদ্ধবাবু তাঁদের ভয়ানক অপছন্দ করেন। রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যসচিব মনীশ গুপ্ত সেভাবে বুদ্ধবাবুকে তোয়াজ করতেন না। তার চরম প্রতিহিংসা তিনি নিয়েছিলেন মনীশবাবুকে অবসরের পর কোথাও নিয়োগ না করে। বামফ্রন্টের রাজত্বে তিনিই একমাত্র মুখ্যসচিব যাঁকে অবসরের পর কোনও সাম্মানিক পদে বসানো হয়নি। একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে মনীশবাবুকে উচ্চপদে যোগ দিতে অনুরোধ

(এরপর ৪ পাতায়)

সীমান্তে নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করা হোক ঃ আর এস এস

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকরী মন্ডল (রাজগীর বৈঠক- ৯-১০-১১ অক্টোবর, ০৯) ভারত-তিব্বত (চীন অধিকৃত) সীমান্তের বিভিন্ন ঘটনায় গভীর ভাবে উদ্বিগ্ন। সঙ্ঘ এই বৈঠকে গৃহীত এক প্রস্তাবে বলেছে, সম্প্রতি এবিষয়ে অনেক উদ্বেগজনক খবর সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট ভারতীয় কর্তৃপক্ষও তা স্বীকার করেছেন। সেখানে সম্প্রসারণবাদী চীনের ভারত-ভূমি দখলের উদ্দেশ্যে লাগাতার প্রচার চালিয়ে যাওয়ার ঘটনায় সঙ্ঘ গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

ওই সকল খবরে দেখা গেছে চীন কমপক্ষে ২৭০ বার লাইন অফ্ কন্ট্রোল উল্লঙ্ঘন করেছে। চীনের পীপুলস্ লিবারেশন আর্মি গত এক বছরে ২,২৮৫ বার আক্রমণাত্মক ভাবে সীমান্ত বরাবর টহল দিয়েছে। অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয় হল — রাজনৈতিকভাবে বিপদের আশঙ্কা সম্পর্কে দেশবাসীকে বিরুদ্ধ শক্তির লালসা বিষয়ে সতর্ক করার পরিবর্তে সংবাদমাধ্যমকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে আসন্ন বিপদকে খাটো করে দেখানো হলো। এটাও অত্যন্ত বেদনাদায়ক এবং নিরুৎসাহজনক যে, নেতারা চীনের সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিহত করার বদলে আমাদের ন্যূনতা নিয়ে বিবৃতি দিতে থাকলেন যা পরাজিত মানসিকতার দ্যোতক। এটাও দুর্ভাগ্যজনক যে, আমাদের চারপাশের দেশের তর্জন-গর্জন ও আস্ফালনের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের প্রতিক্রিয়া খুব একটা

ভারতকে নাস্তানাবুদ করার উদ্দেশ্যে চীন কৌশলগত ভাবে তিনটি 'ই' বৃদ্ধি করেছে–

- **এনগেজমেন্ট।**
- **এনসার্কেলমেন্ট।**
- **শত্রুদের এনকারেজমেন্ট।**

কড়া হওয়ার বদলে গতানুগতিক। একমাত্র ব্যতিক্রম ও ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত হলো তিব্বতীয় ধর্মগুরু ও রাষ্ট্রপ্রধান মহামতি দলাই লামাকে আশ্রয় দেওয়া। এছাড়া তিব্বতের ব্যাপারে আমরা বারবার ভুল ও ক্ষতিকারক পদক্ষেপ নিয়ে তিব্বতে চীনের আক্রমণকে স্বীকার করে নিয়েছি। ফলে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশকে চীন গ্রাস করে নিয়েছে। চীন পরে আরও আগ্রাসী হয়ে পঞ্চাশের দশকে লাদাখ অঞ্চলের আকসাই চীন (অক্ষয় চিহ্ন)-কে গ্রাস করেছে। ফলত, ১৯৮৭ সালে সামদরং চু উপত্যকা রফাসূত্রে চীন হস্তগত করেছে। আমাদের দুর্বল মানসিকতার ফলে উদ্বুদ্ধ হয়ে চীন তো এখন পুরো অরুণাচল প্রদেশের উপর তাদের কর্তৃত্ব দাবী করছে। অখিল ভারতীয় কার্যকরী মন্ডল ভারতের সম্ভাব্য আগ্রাসনের ঘটনায় ভারতের প্রতিক্রিয়াকে প্রয়োজনের তুলনায় কম বলে মনে করে। কার্যকরী মন্ডলের দাবী সরকার অনতিবিলম্বে ভারত-তিব্বত সীমান্তে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করুক। একই সঙ্গে জলসীমা ও ভারত-পাক এবং ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে প্রতিরক্ষা আরও কঠোর করুক। ভারত-তিব্বত সীমান্তের ওপারে চীনের ব্যাপক সৈন্য সমাবেশ ও পরিকাঠামো বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে ভারত ও ভারতীয় এলাকায় ভারত-তিব্বত সীমান্তে সেনাসংখ্যা বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে তাদের দক্ষতাও বৃদ্ধি করুক।

ভারতকে নাস্তানাবুদ করার উদ্দেশ্যে চীন কৌশলগতভাবে তিনটি 'ই' বৃদ্ধি করেছে — এনগেজমেন্ট, এনসার্কেলমেন্ট এবং শত্রুদের এনকারেজমেন্ট করে যাচ্ছে। মায়ানমারের দক্ষিণে কোকো দ্বীপে (ভারত মহাসাগর) চীন রীতিমতো পুরো দস্তুর সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করেছে। এছাড়াও শ্রীলঙ্কায় বাণিজ্যবন্দর এবং পাকিস্তানের সিন্ধুপ্রদেশের গদর-এ সামরিক বন্দর স্থাপনে চীনা অভিযানের প্রস্তুতি চূড়ান্ত হয়েছে। ভারত তিব্বত সীমান্ত বরাবর সামরিক উস্কানি এবং ভারত-মায়ানমার সীমান্ত দিয়ে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সন্ত্রাসবাদী এবং রাষ্ট্রবিরোধীদের ভারতে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। তদতিরিক্ত চীন ভারতকে টুকরো টুকরো করার হুমকি দিয়ে রেখেছে। সঙ্ঘের কার্যকরী মন্ডল সরকারের অতি সতর্ক পদক্ষেপের ফলে ভারতের ভৌগোলিক ও কূটনীতি ক্ষেত্রে যে পশ্চাদ অপসরণ হয়েছে সেজন্য গভীরভাবে মর্মাহত। এছাড়া চীন এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক (এ ডি বি) থেকে অরুণাচলের উন্নয়ণের জন্য ঋণের ব্যাপারে আপত্তি জানিয়ে আমাদের প্রচেষ্টা বানচাল করার ধূর্ত প্রয়াস চালিয়েছে। এমনকী যে সকল দেশ আমাদের পারমাণবিক সহায়তা করে সেক্ষেত্রেও ভারতবর্ষের উপর প্রতিবন্ধ চাপানোর

(এরপর ৪ পাতায়)

আয়ের সুবর্ণ সুযোগ!!!
SBI Life Insurance প্রমোট করছে ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্ক State Bank of India, SBI Life সীমিত সংখ্যক Insurance Advisor নিয়োগ করছে।
যে কোনও পুরুষ / মহিলা HS পাশ / পিয়ারলেস, GTFS, Alchemist, Rose Valley ও সাহারা Agent / VRS নেওয়া Govt. Employee / Postal Agent / অবসরপ্রাপ্ত Bank Employee-রা আবেদন করতে পারেন।
যারা সফল কেরিয়ার করতে ইচ্ছুক তারা Interview-র জন্য যোগাযোগ করুন –
Mr. Ajoy Kumar Saha Mobile : 9830952221
SBI Life
INSURANCE
With Us, Your's Sure

ভারতীয় ভাবনাই পরিবেশ দূষণ থেকে বিশ্বকে বাঁচাতে পারে

।। সম্প্রতি রাজগীরে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বৈঠকে গৃহীত দ্বিতীয় প্রস্তাব।।

শত সহস্র বৎসর ধরে অপ্রতিহত গতিতে প্রবাহিত প্রকৃতির অবিরাম ছন্দ বিগত কয়েক দশকে হঠাৎ-ই যেন কিছুটা বিপত্তির মধ্যে গিয়ে পড়েছে। অখিল ভারতীয় কার্যকারিণী সভা এ নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। এই গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সঙ্কটের লক্ষণীয় বিষয়গুলি হলো — জলের অভাব বৃদ্ধি পাওয়া, বায়ুদূষণ, বনাঞ্চ লের পরিমাণ ক্রমাগত কমে যাওয়া এবং জীব-বৈচিত্র্যের ধবংস সাধন। আর এই সবের পরিণতিতে দুনিয়া জুড়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে ভোগবাদ এবং অনিয়ন্ত্রিত ভোগবাদের ফলে সমূহ ক্ষতি হচ্ছে প্রাকৃতিক শক্তিগুলির।

'অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সংগ্রাম' এবং 'প্রকৃতিকে ধবংস' — এই দুই মতবাদের উপর গড়ে ওঠা পশ্চি মী ব্যক্তিকেন্দ্রিক দর্শনের সরাসরি কু-প্রভাবে প্রাকৃতিক চক্রের এই ভারসাম্যহীনতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিণামে দেখা যায়, বিশ্বের উন্নত দেশগুলির জনসংখ্যা যেখানে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার মাত্র ১৬ শতাংশ, সেখানে ওই দেশগুলি থেকে নির্গত কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসের পরিমাণ বাকি বিশ্বের সর্বমোট নির্গত কার্বন-ডাই-অক্সাইডের চেয়ে পঞ্চা শ শতাংশরও বেশি। যেমন আমেরিকায় সমগ্র বিশ্বের মাত্র চার শতাংশ মানুষ বসবাস করে অথচ সেখানেই গোটা পৃথিবীর পঁচিশ শতাংশ কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস নির্গত হয়। এই কারণেই বিংশ শতাব্দীতে যেখানে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছিল ০.৭° ফারেনহাইট থেকে ০.১৪° ফারেনহাইট মাত্রায়, সেখানে একবিংশ শতাব্দীতে এই তাপবৃদ্ধির মাত্রা পৌঁছেছে ২.৫° ফারেনহাইট থেকে ১০° ফারেনহাইটে।

একদিকে জীব-বৈচিত্র্য ধবংস, বায়ু -মন্ডলের ওজোন স্তর নিঃশেষিত হয়ে যাওয়া, বিশ্বব্যাপী রোগের প্রাদুর্ভাব এবং অন্যদিকে বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে বরফ গলে যাওয়ার ফলে সমুদ্রের জলস্তরের ০.২-১.৫ মিটার উচ্চতাবৃদ্ধি ও যার দরুণ ঈশানকোণে বিপদ সংকেতের পূর্বাভাষের মতো পৃথিবীর স্থলভাগের একটা বড় অংশ সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে যাবার ইঙ্গিত মিলেছে।

আমাদের দেশেও, কিছু ত্রুটিপূর্ণ জীবন যাত্রা প্রাকৃতিক চক্রের এই ভারসাম্যহীনতাকে প্রভাবিত করছে। আজকে, যেখানে বনাঞ্চ ল দরকার দেশের মোট আয়তনের ৩৩ শতাংশ, সেখানে মাত্র ২০ শতাংশ জায়গা জুড়ে ভারতে বনাঞ্চ ল রয়েছে। ভারতে ৮০ শতাংশ রোগই হচ্ছে দূষিত জল খেয়ে এবং স্বাস্থ্যবিধি না মানার দরুণ। কারণ আমাদের দেশের ৭৫ শতাংশ মানুষই বাধ্য হচ্ছেন দূষিত জল ব্যবহার করতে। প্রত্যেক বছর, দেশের মধ্যে অর্ধেক জেলাই হয় খরার কবলে পড়ছে কিংবা বন্যায় প্লাবিত হচ্ছে। মাটির নিচে জলস্তর ক্রমাগত কমে যাওয়া, গরমে প্রচন্ড হারে উষ্ণতা-বৃদ্ধি, রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের দরুণ হাজার হাজার একর কৃষিজমির নোনতা ও বিষাক্ত হয়ে ওঠা — এসবই কিন্তু বিপদ সংকেত। 'ব্যবহার কর এবং ফেলে দাও' (ইউজ অ্যাণ্ড থ্রো) — এই সংস্কৃতির কারণে থার্মোকল এবং প্লাস্টিক জাতীয় দ্রব্যের দ্বারা আবর্জনার স্তূপ তৈরি করে এবং মেট্রো শহরগুলিতে শিল্পের কারণে বেড়ে চলা বায়ুদূষণ, শব্দ দূষণ ও জলদূষণ একের পর এক রোগ সৃষ্টিতে ভাটার টান পড়তে দেয়নি।

এই আন্তর্জাতিক পরিবেশ সংকট-এর মূলে রয়েছে বর্তমান বৈশ্বিক দর্শন। ক্ষয়প্রাপ্ত ও যান্ত্রিক এই বৈশ্বিক দর্শনকে অস্বীকার করার কোনও উপায় এই মুহূর্তে চোখে পড়ছে না। 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা' (সংযমপূর্ণ ভোগবাদ) -এর উপর ভিত্তি করে গড়ে তোলা পবিত্র এবং একাত্ম-মানবদর্শন আজকের দিনে খুবই দরকার। অখিল ভারতীয় কার্যকারিণী মন্ডল মনে করছে হিন্দুর বিশ্বরূপ দর্শন অর্থাৎ মানবজাতি, পরিবেশ এবং জীবজগতের প্রতি একাত্মতার অনুভূতি এবং 'পঞ্চ মহাভূতে'র (পাঁচটি মহাবিশ্বের উপাদান অর্থাৎ পৃথিবী, জল, আগুন, বায়ু এবং আকাশ) প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, 'বিশ্বমাতা'র তত্ত্বে বিশ্বাসী হওয়া এবং পরিবেশ ও প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষার জন্যে জল-জমি-বন এবং বন্যপ্রাণী রক্ষা করা — এই পরিস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে। এই 'বিশ্বরূপ দর্শন' অবশ্যই আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত হওয়া উচিত।

অখিল ভারতীয় কার্যকারিণী মন্ডল মনে করছে এ বিষয়ে আমাদের দেশের নীতি-নির্ধারক এবং সমাজের সদর্থক ভূমিকা নেওয়াটা জরুরি। আমাদের সংবিধানের ৪৮ এ এবং ৫১-এ ধারা অনুযায়ী, নাগরিক এবং রাষ্ট্র উভয়ের ক্ষেত্রেই পরিবেশ, জলের উৎস এবং বন্যপ্রাণীকে রক্ষা করাটা অবশ্য কর্তব্য। এই প্রেক্ষিতে একটা প্রাসঙ্গিক বিষয় হলো কোনও নদী যা জলের মূল উৎস তার খরস্রোতকে বাধাদান করে বহু ক্ষেত্রেই পরিবেশকে বিপদের মধ্যে টেনে আনা হয়।

আমাদের পবিত্র বৈশ্বিক দর্শনের রীতির মধ্যে রয়েছে নদী এবং গাছকে পুজো করার প্রবহমান পরম্পরা। রাজস্থানে, আজ থেকে ৩৭০ বছর আগে ৩৬৩ জন মানুষকে নিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামী ইমারতি দেবী গাছ কাটার বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যা আজও জীবন্ত নজির হয়ে আছে। স্বাধীন ভারতে পরিবেশ রক্ষায় উদ্যোগী হয়ে চিপকো আন্দোলন এবং বর্তমানে কর্ণাটকে বৃক্ষরক্ষা আন্দোলন কর্মসূচী গৃহীত হয়েছিল, যা যে কোনও উৎকর্ষতাকে ছাপিয়ে যাবার জন্য যথেষ্ট।

অখিল ভারতীয় কার্যকারিণী সভা কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের কাছে নিম্নলিখিত বিষয়ে আবেদন করছে —

১. আমাদের দেশে জলের উৎসের রক্ষা এবং উন্নতির জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক।

২. জৈবিক পদ্ধ তি ব্যবহার করে প্রাকৃতিক ও জৈবিক কৃষি পদ্ধ তির মাধ্যমে জমি (সংরক্ষিত মাটি) পুনরুদ্ধার করার ব্যবস্থা করা একান্তভাবেই প্রয়োজনীয়।

৩. হিমালয় ও অন্যান্য পর্বতমালার পরিবেশ রক্ষায় বিশেষ পরিকল্পনা তৈরি হোক।

৪. বিভিন্ন বিকল্প শক্তির উৎসগুলি-র উন্নতির চেষ্টা করা দরকার।

৫. শিল্পের কারণে জল এবং বায়ু দূষণের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন এবং গঙ্গা-যমুনাসহ যাবতীয় নদীগুলিতে দূষণ চিরতরে বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া একান্তভাবেই জরুরী।

৬. যে কোনও প্রকল্পই বাস্তবায়িত হোক না কেন, এটা নজর রাখা উচিত তাতে যেন গঙ্গার জলস্রোত বাধাপ্রাপ্ত না হয়।

সমাজকে কেন্দ্র করে গড়ে তোলা সঠিক নীতিই গ্রহণ করা উচিত। পরিবেশ সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপারে এবং এর উন্নয়ণে আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের বিষয়গুলোকে মাথায় রাখা দরকার। সেই কারণে এই বিষয়ে অন্যায় এবং অনুচিত কোনও আন্তর্জাতিক মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন করা উচিত নয়।

অখিল ভারতীয় কার্যকারিণী সভা স্বয়ংসেবক সহ দেশের সমস্ত নাগরিকবৃন্দের কাছে আবেদন জানাচ্ছে — শুধুমাত্র সরকারের ওপর নির্ভর না করে তাদেরকেই জল সংরক্ষণ, প্লাস্টিক এবং বিদ্যুৎ-এর ন্যূনতম ব্যবহার, বনভূমি রক্ষায় উদ্যোগী হয়ে এগিয়ে আসতে হবে। আমাদের কোনও রীতি-নীতির জন্য যাতে কোনও দূষণ না ছড়ায় বা পরিবেশের ভারসাম্য কোনওভাবেই যাতে বিঘ্নিত না হয় সেদিকে সকলের খেয়াল রাখা উচিত।

আমাদের এই সচেতনতা জাগ্রত করতে হবে নিজস্ব কর্মের উদাহরণ এবং দেশের পরিবেশ রক্ষায় গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ কর্মসূচীতে সহযোগিতার মাধ্যমে।

গ্রামকেই বিকাশের কেন্দ্রবিন্দু করতে হবে

।। সম্প্রতি রাজগীরে অনুষ্ঠিত সঙ্ঘের বৈঠকে গৃহীত তৃতীয় প্রস্তাব।।

সমৃদ্ধ ও স্বাবলম্বী ভারতের স্বপ্ন দেখতেন যে সকল মহাপুরুষ, তাঁরা সকলেই একটি বিষয়ে বিশেষ জোর দিতেন। তা হলো ভারতের আত্মা হচ্ছে গ্রাম। ভারতের প্রকৃত উন্নয়ণের পথটাও গ্রামের উন্নয়ণ থেকেই শুরু হয়। মহাত্মা গান্ধী তাঁর হিন্দ স্বরাজ, দীনদয়াল উপাধ্যায় তাঁর একাত্ম মানব দর্শনে এই বিষয়ে বেশি গুরুত্ব দেন। চিত্রকূটে এই ভাবনার বাস্তব রূপ দিয়েছেন বিশিষ্ট সমাজসেবী নানাজী দেশমুখ। বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ডঃ রামমোহন লোহিয়া গ্রাম বিকাশের মধ্য দিয়ে দেশের সার্বিক উন্নয়ণের কথা চিন্তা করেছিলেন। গান্ধীজী স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় বলেছিলেন, শুধুমাত্র ভারতই নয়, সমগ্র বিশ্বের প্রকৃত স্বাধীনতা তথা উন্নয়ণের লক্ষ্যে আজ না হয় কাল গ্রামকেই বিকাশের কেন্দ্রবিন্দু করতে হবে। তাই তিনি কৃষিকাজ, গো-পালন তথা অন্যান্য গ্রামীণ শিল্পের. লক্ষ্যে গ্রামে গ্রামে গোকুল গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন।

সাম্প্রতিককালে আর্থিক মন্দা ও পরিবেশ বিপর্যয় সমগ্র পাশ্চাত্য জীবনধারার ক্ষেত্রে প্রশ্ন চিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমাজবাদের পতন ও পুঁজিবাদের বিপর্যয় মানব সমাজকে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করছে। সমগ্র মানবজাতিকে তাঁর পার্থিব তথা আধ্যাত্মিক উন্নয়ণের জন্য নতুন পথ সন্ধানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে হচ্ছে।

অখিল ভারতীয় কার্যকরী মন্ডলের দৃঢ় বিশ্বাস কেবলমাত্র ভারতই এই ধরনের পথের সন্ধান দিতে পারে। এই দৃঢ় বিশ্বাসের কারণ— মানুষ, সমাজ ও প্রকৃতির মধ্যে সুষ্ঠু সম্বন্বয় সাধন, যা ভারতের গ্রামীণ জন-জীবনে যুগ যুগ ধরে পালিত হয়ে আসছে। ওই সমাজ জীবনের ওপর ভিত্তি করেই ভারত সমগ্র বিশ্বে সর্বাধিক উন্নয়ণ তথা জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করেছিল। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরও পাশ্চাত্য দৃষ্টি-ভঙ্গীর অনুসরণ করতে করতে আমরা মূল দৃষ্টিভঙ্গী ভুলে গিয়ে, মোট ঘরোয়া উৎপাদনের (Gross Domestic Product) বিকাশে এমন ফর্মূলা ব্যবহার করেছি, যা পাশ্চাত্য জগতেও আমাদের বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে। ঘরোয়া উপাদানের এই বিকাশের পরিণামস্বরূপ গ্রামীণ ভারতকে নিরন্তর উপেক্ষা করা হয়েছে। কৃষি অ-লাভদায়কে পরিণত হতে থাকে। গ্রামীণ উদ্যোগ ক্রমশ কমতে থাকে। গ্রামে রোজগারের অভাবে ও সেই সঙ্গে প্রয়োজনীয় শিক্ষা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, পরিকাঠামোর অভাবে মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরমুখী হতে থাকে। এই শহরমুখী হওয়ার আরও একটা কারণ পাশ্চাত্য সংস্কৃতির আক্রমণ, এর জন্যও গ্রাম থেকে শহরের দিকে মানুষের ছোটাছুটি শুরু হয়। গ্রাম থেকে সংগৃহীত কাঁচা মাল যদি প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে গ্রামীণ শিল্পের কাজে লাগানো যেত, তাহলে এই পরিস্থিতির উদ্ভব হতো না। এরই অভাবে গ্রামীণ অর্থ ব্যবস্থা ভেঙে পড়তে থাকে। কৃষি ক্ষেত্রে দিনকে দিন বিনিয়োগ কমতে থাকা ও পঞ্চ বার্ষিকী যোজনায় কৃষিক্ষেত্রে আর্থিক বরাদ্দ কমে যাওয়া এর বাস্তব উদাহরণ। গ্রামীণ শিল্প ও কৃষিভিত্তিক শিল্পে আর্থিক বিকাশও কমে গেছে। এ জন্য সরকারের উচিত গ্রামোপযোগী উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, রোজগার, রাস্তা-ঘাট, পরিকাঠামো, গ্রামীণ বিপণন ব্যবস্থাকে মজবুত করা। সরকারের উচিত এমন এক গ্রামীণ রূপরেখা তৈরি করা, যা পরিবেশের পক্ষে সহায়ক হবে, সেই সঙ্গে সামাজিক সমরসতার পাশাপাশি দেশের প্রগতিরও সহায়ক হয়।

কার্যকরী মন্ডলের অভিমত হল গো-বংশ কেন্দ্রিক তথা জৈবিক ও প্রাকৃতিক কৃষি নির্ভরশীল শিল্প ও স্বাবলম্বী গ্রাম-ই ভারতকে পরম বৈভবশালী রাষ্ট্রে পরিণত করতে পারে। বিভিন্ন পরীক্ষায় দেখা গেছে যে জৈবিক ভিত্তিতে কৃষি কাজে উন্নতমানের শস্য উৎপাদন সম্ভব। বিভিন্ন উচ্চ প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পরম্পরাগত বিজ্ঞান পদ্ধ তির সঙ্গে আধুনিক পদ্ধ তির তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে একটি গ্রামীণ বিকাশের রূপরেখা গড়ে তোলা উচিত। আজ পার্থিব বিলাসিতা বা লালসা আমাদের সামাজিক, পারিবারিক জীবনে বিভেদ তৈরি করছে। সাংস্কৃতিক বিশৃঙ্খলা যার অন্যতম দৃষ্টান্ত। গ্রামের সরল জীবন-যাপনই এর বিকল্প হতে পারে। গোরু আমাদের প্রতিবেশীদের সঙ্গে যুক্ত রাখে। গোবংশ নির্ভর গ্রামীণ ব্যবস্থা কেবলমাত্র কম পুঁজির পাশাপাশি যান্ত্রিক ব্যবহার সীমিত করার ফলেও তা যথেষ্ট লাভজনক। প্রাকৃতিক সার বা কীটনাশক প্রয়োগ করে জমির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি র প্রয়োজন রয়েছে। গোবর গ্যাসকে বিকল্প জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। পঞ্চ গব্যকে (দুধ, দই, ঘি, গোমূত্র ও গোবর) ঔষধি হিসাবে ব্যবহার, সেই সঙ্গে দই, ঘি-এর মাধ্যমে গ্রামবাসীদের রোজগারেরও সুযোগ রয়েছে। কৃষকদের ক্ষেত্রে হাল ব্যবস্থা হালবিহীন বা প্রাকৃতিক পদ্ধ তির চাষ আবাদ বেশি লাভদায়ক হবে। এমন গো-গ্রাম জীবন ব্যবস্থা কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এই ধরনের স্বাবলম্বী গ্রাম ব্যবস্থা আর্থিক ও পরিবেশ সঙ্কট থেকে মুক্তি দিতে পারে। ফসল চক্র, সবুজ শস্য, জৈব সার, প্রাচীন জলসেচ ব্যবস্থা যেমন পুকুর, জলসত্র কুয়ো ও উপযুক্ত প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগের মাধ্যমে গ্রামীণ ব্যবস্থা পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব। প্রাকৃতিক শক্তির উপযুক্ত ব্যবহার শুধু শক্তির অভাব পূরণই করে না, সেই সঙ্গে কার্বন নির্গমণও কম করে।

সন্ত ও ধর্মগুরুদের নেতৃত্বে গো-গ্রাম যাত্রা এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় জাগরণের ক্ষেত্রে এক অভিনব প্রয়াস। কার্যকরণী মন্ডল এই যাত্রাকে সমর্থন করে। কার্যকরী মন্ডলের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে আবেদন, সরকার অবিলম্বে একটি (ব্লু-প্রিন্ট) নীলনকশা তৈরি করুক, যাতে গ্রাম নির্ভর অর্থব্যবস্থার ওপর বিভিন্ন পরিকল্পনার কথা থাকবে। কার্যকরী মন্ডল সমগ্র সমাজকে স্বার্থপরতা ত্যাগ করে, সমৃদ্ধ ভারত নির্মাণের লক্ষে 'চল গ্রামে চলি' (চলে গ্রাম কি অউর) সঙ্কল্পে সঙ্কল্পবদ্ধ হতে আহ্বান জানাচ্ছে।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

চীন আজ নিজেই ড্রাগনের প্রতীক

মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বের কথা। বাজপেয়ী সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জর্জ ফার্ণান্ডেজ বলিয়াছিলেন ‘চীন হইতে সাবধান’। কারণ চীন হইতেছে আগামী দিনে ভারতের পক্ষে এক ভয়াবহ বিপদস্বরূপ। স্মরণে আছে সেই সময়ে ফার্ণান্ডেজের এই উক্তি লইয়া অনেক বিশেষজ্ঞগণ অনেক কটুক্তি করিয়াছিলেন।

কিন্তু নানান ঘটনায় আজ চীনের এই আগ্রাসী স্বরূপ ক্রমশই প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে। তাহাদের আগ্রাসী চরিত্র তাহাদের সীমান্তের গন্ডী অতিক্রম করিয়া ভারতের মাটি গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। দৃঢ় জাতীয়তাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত বাজপেয়ী সরকারের আমলে যাহা করিতে সাহস পায় নাই, দুর্বল মনমোহন সিং-এর কংগ্রেস সরকারের আমলে চীন নিত্যই একটা না একটা ব্যাপারে ভারতের অভ্যন্তরে নাক গলাইয়া চলিয়াছে। কখনও সীমানা পার হইয়া এপারে গুলি বর্ষণ করিয়া চোরের মতো পলায়ন করিতেছে, তো কখনও দলাই লামাকে ভারতে আশ্রয় দেওয়ার জন্য ভারতকে ধমকাইতেছে। অথচ এই চীনই একদিন কাম্বোডিয়ার রাজা নরোদম সিহানুককে শুধু আশ্রয়ই দেয় নাই, চীনের মাটিতে সিহানুককে নির্বাসিত সরকার (Govt. in exile) গঠন করিতে সমস্ত রকম সাহায্য দিয়াছিল। কিন্তু দলাই লামাকে শুধুমাত্র আশ্রয় দেওয়ায় সেই চীনই ভারতের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করিতে কসুর করিতেছে না। তাহাদের দলীয় সৈনিকগণ প্রায়ই ভারতের আকাশ লঙ্ঘন করিতেছে। প্রতিবাদ করিলে বলিতেছে “আমরা ভারতীয় ভূমি লঙ্ঘন করিতেছি না।” কারণ অরুণাচল প্রদেশ তো, তাহাদের মতে, চীনেরই ভূমি।

চীনের এইসব ভারত বিরোধী কার্যকলাপ পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি হইলেই মনমোহনজী বড় ভয় পাইয়া যাইতেছেন। বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন, “চীন এমন কিছু করে নাই যে তাহার বিরুদ্ধে এত লেখালেখি করিতে হইবে।” ভগবান জানেন এর কারণ কী।

কিন্তু কারণ যাহাই হোক অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়াই অধর্ম। আর অধার্মিকের বৈশিষ্ট্যই হইল প্রশ্রয় পাইলেই প্রশ্রয়কারীকেই আঘাত দেওয়া। তাই চীন আজ মনমোহনকেই অরুণাচল প্রদেশ ভ্রমণ করিতে নিষেধ করিয়াছে। কারণ চীনের মতে এটা বিতর্কিত ভূমি। কিন্তু পাক-অধিকৃত কাশ্মীর-ভূমিও তো বিতর্কিত ভূমি। চীন কি করিয়া এই ভূমিতে পাকিস্তানের মদতে নানান নির্মাণ প্রকল্পে অংশগ্রহণ করে? এই হল কমিউনিস্ট চরিত্র। এখনতো আবার তিবব্ত সীমান্তে ব্রহ্মপুত্র নদীর উপর ১১৬ মিটার ৩৮৯.৫ মিটার দীর্ঘ এক বাঁধ নির্মাণের প্রস্তুতি উঁচু শুরু করিয়া দিয়াছে। এটি নাগমু হাইড্রোলিক প্রজেক্ট নামে পরিচিত। ব্রহ্মপুত্রের নীচের দিকে আসাম যে বর্ষায় ভাসিবে এবং গ্রীষ্মে খরাক্রান্ত হইবে একথা বুঝিতে হইলে বিশেষজ্ঞ হইবার প্রয়োজন নাই। অথচ তিন বছর আগেই দুই দেশের মধ্যে Expert Level Mechanism গঠিত হইয়াছিল। চীন কোনও কিছুকেই তোয়াক্কা না করিয়াই গত রবিবার (অক্টোবর ১৮) ব্রহ্মপুত্রের স্রোতধারাকে দক্ষিণ-উত্তরমুখী করার সমস্ত পরিকল্পনা প্রকাশ করিয়া দিয়াছে।

ভারতের সার্বভৌমত্বে ভারতের কমিউনিস্টদের নিশ্চয়ই বিশ্বাস নাই। তাহা না হইলে তাহারা কমিউনিস্ট চীনের এহেন আগ্রাসী কার্যকলাপে চুপ কেন! অযোধ্যা কিংবা গুজরাতের ব্যাপারে তো তাহারা সবচেয়ে সরব ছিল। চীন আজ কেবল বহিঃশত্রু নয়, বাণিজ্যের নাম করিয়া এদেশে ঢুকিয়া সে আভ্যন্তরীণ আর্থিক বাণিজ্যিক ক্ষতি করিতেও উদ্যত হইয়াছে। একে তো সস্তা নিম্নমানের বেআইনী দ্রব্যে বাজার ভর্তি করিয়া দেশীয় দ্রব্যের বিক্রি অনেক কমাইয়া দিয়াছে। দেশীয় কুটির শিল্প ধবংসের মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। সম্প্রতি ভারতীয় স্টীল কোম্পানীগুলি চীনের সস্তা স্টীলের খপ্পরে পড়িয়াছে। ভারতীয় স্টীলের দাম যেখানে ৩১,০০০ হইতে ৩৫০০০ টাকা টন (৬৫০ ডলার), সেখানে চীন ৪০-৫০ ডলার কম দামের স্টীল বাজারে আনিয়াছে। ফলে চীন থেকে ইস্পাত আমদানী গত আগস্টে ৯ শতাংশ বাড়িয়া গিয়াছে। ভারতীয় ইস্পাত প্রস্তুতকারকগণ ভারত সরকারের নিকট সুরক্ষা ব্যবস্থা দাবী করিয়াছে।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

আমরা কেবল এটাই চাই যে পৃথিবীতে আমাদের পবিত্র ধর্ম এবং সংস্কৃতি যেন তার গৌরবময় স্থান চিরকালের জন্য অধিকার করে। আমাদের ধর্ম ও সংস্কৃতি যতই শ্রেষ্ঠ হোক না কেন, তাকে রক্ষা করবার মতো শক্তি যদি আমাদের না থাকে তবে পৃথিবীতে তা কখনই সম্মান লাভ করতে পারবে না। আমরা শক্তিহীন বলেই আমাদের অতি দীন-হীন দশা! সব কিছু থাকলেও শক্তি ছাড়া চলে না। “জীবো জীবস্য জীবনম” অর্থাৎ যারা দুর্বল তারা শক্তিমানের ভক্ষ্য — এই হল পৃথিবীর নিয়ম। পৃথিবীতে দুর্বল ব্যক্তি কখনও সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকতে পারে না। শক্তিমানের দাসত্ব তাকে করতেই হবে। অপমান ও কষ্ট তার ভাগ্যে লেখা আছে। সুদূর অতীত হতে কেন আমাদের দেশে বিদেশী আক্রমণ চলে আসছে? আমরা দুর্বল ও মরণোন্মুখ হয়ে পড়েছি বলে নয় কি? আমাদের এই দুর্বলতাই আমাদের সমস্ত বিপত্তির মূল কারণ। একে সমূলে উৎপাটিত করে ফেলতে হবে। যতদিন আমরা দুর্বল থাকব, ততদিন স্বাভাবিক ভাবেই অন্যান্য শক্তিশালী জাতি আমাদের উপর আক্রমণ করবার চেষ্টা করবে। তাদের কেবল গালি বা নিন্দা করে কি লাভ? এমন করলেই পরিস্থিতির পরিবর্তন হবে না। যদি আমরা শক্তিশালী হতাম তবে কেউ কি আমাদের আক্রমণ করতে পারত?

— ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার (ডাক্তারজী)

দূর থেকে দেখা

পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তন ক্ষণস্থায়ী ও ধ্বংসাত্মক

স্বপন দাশগুপ্ত

গণমাধ্যমের দৃষ্টিকোণ থেকে তিন রকমভাবে ভারতবর্ষের একটি অঙ্গরাজ্যের রাজনীতিকে ব্যাখ্যা করা যায়। প্রথমত, ঘটে যাওয়া ঘটনাবলীর প্রতি সুতীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ও তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে। দ্বিতীয়ত, আঞ্চলিক রাজধানীর প্রতি সুবিবেচনাপূর্ণ ও অন্যান্য অংশের তুলনায় কিছুটা পক্ষপাতপূর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে এবং সর্বোপরি, যেটাকে বলা যেতে পারে বর্তমান জগতের সঙ্গে একরকম যাবতীয় সম্পর্করহিত একটা চিন্তাধারা থেকে। আসলে দূর থেকে পশ্চিমবঙ্গের মাখন তোলা অবস্থাটা বিচার করার চেষ্টা হচ্ছে। বিদেশী প্রতিনিধিদের প্রতিবেদনগুলি-র অতি সরলীকৃত ব্যাখ্যায় আমাদের ধারণাগুলো পাল্টে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। যাই হোক, পশ্চিমবঙ্গের সম্বন্ধে যে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হতে গেলে স্থানীয় ঘটনা প্রবাহের কান্ড-কারখানার সঙ্গে জড়িত লোকজনদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে। বিশেষ করে দেশের সামনে নিজেদের ভাবমূর্তি তুলে ধরতে গেলে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এই কথাটা বেশ মানানসই হতে পারে।

শুরু করা যেতে পারে সদ্য সমাপ্ত লোকসভা নির্বাচন দিয়ে। নির্বাচনের ফল প্রকাশের অব্যবহিত পরেই মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি গত ২২ জুন হতাশার সুরে এক বিবৃতি জারি করে বলেছে, “দল এক ভয়াবহ বিপর্যয়ের বাঁকে দাঁড়িয়ে। সারা দেশে ১৬টি আসনের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে মাত্র ৯টি আসন দল পেয়েছে”। তারা বিশ্লেষণ করে দেখেছে যে, সারা দেশে তারা মাত্র ৫.৩৩ শতাংশ পেয়েছে এবং এই শোচনীয় দশার জন্য দায়ী গত নির্বাচনের তুলনায় মাত্র ০.৩৩ শতাংশ কম ভোট পাওয়া এবং এরই জেরে আসন সংখ্যা ২০০৪-এর তুলনায় ২০০৯-এ নেমে দাঁড়িয়েছে ৪৩ থেকে ১৬-তে। কমিটি উদ্বেগ ব্যক্ত করেছে পশ্চিমবঙ্গে এবং কেরলে তাদের পক্ষে জনমত হ্রাস পাওয়ার জন্য। বিপর্যয়ের মুখেও কমিটি ব্যক্ত করেছে যে, বাংলায় তারা পেয়েছে ১.৮৫ কোটি ভোট এবং কেরলে ৬৭.১৭ লক্ষ ভোট। কিন্তু এখানে আত্মতুষ্টির অবকাশ নেই। দল এই বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়েও বলছে যে, “যদিও কিছু ক্ষেত্রে ভোট কম পাওয়া গেছে তবুও এই দুই রাজ্যে মোটামুটি ভিত এখনও মজবুত”।

কেরলে যে দল বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে তা জেনেও দল উদাসীন ছিল, কারণ কেরলে তাদের ভোট এরকমই ওঠা নামা করে। কেন্দ্রীয় কমিটি পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে উদাসীনতার দায় এড়াতে পারে না। কিন্তু এবারে যেভাবে ভোটার সংখ্যা বেড়েছে এবং যত ভোট পড়েছে তারই নিরীখে ফ্রন্ট ৭.৪২ শতাংশ ভোট কম পেয়েছে। ২০০৪-এ দল গড়পড়তা যেখানে ৫০.৭২ শতাংশ ভোট পেয়েছিল এবারে তা নেমে দাঁড়িয়েছে ৪৩.৩০ শতাংশে। সি পি এমের নিজস্ব ভোট ভয়ানকভাবে হ্রাস পেয়েছে। ২০০৪ সালে যেখানে দল পেয়েছিল ৩৮.৫৭ শতাংশ এবারে তা নেমে হয়েছে ৩৩.১০ শতাংশে। সবচেয়ে বড় খবর হল যে, কলকাতায় আশেপাশে প্রায় সব আসনেই ফ্রন্ট হেরেছে। এবারে মুসলিম ভোটের ব্যাপক অংশ সি পি এমের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে যে কংগ্রেস-তৃণমূল জোটে ভোট দিয়েছে তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে এবং পরিণামে দলের এমন বড় বিপর্যয়ে শাসক জোট নিজেদের মুখ রক্ষা করেছে কেবল উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি-কোচবিহারের কিছু আসন এবং দূরের জেলাগুলিতে কয়েকটি আসন লাভ করে।

ভোটারদের এমন মতবদল ভাবা যায় না। গত ৩২ বছর ধরে অর্থাৎ ১৯৭৭-র পর থেকে এইসব লোকসভা ও বিধানসভা আসনে অধিকাংশ আসন পেয়ে এসেছে ফ্রন্ট এবং এই বিপর্যয় সত্যই ভীতিপ্রদ। ভারতের অন্য রাজ্য থেকে এরাজ্যে তাদের নীতিতে গুণগত ফারাক রয়েছে। এদের নীতি হল উল্টো পিরামিড অর্থাৎ নীতি নির্ধারণ হয় ওপরতলা থেকে। অন্যান্য বুর্জোয়া দলগুলি যারা সরকারে রয়েছে সেই সরকার প্রাথমিকভাবে নির্বাচনে দেওয়া প্রতিশ্রুতি মতো কাজকর্ম করে। এরা দৈনন্দিন প্রশাসন ও উন্নয়নের কাজ আমলাদের ওপর ছেড়ে দেয়। অন্যদিকেসিপিএম বাংলার প্রশাসনের প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই রাজনীতি ঢুকিয়ে দিয়েছে। লোকাল কমিটিগুলিকে প্রভূত ক্ষমতা প্রদান করেছে। বিশেষত মফঃস্বল এবং গ্রামাঞ্চলগুলিতে এক সমান্তরাল প্রশাসন গড়ে তোলার ও সেইসঙ্গে পুলিশি ব্যবস্থার ওপর নজরদারি করার জন্য। ১৯৭৮ সালে অপারেশন বর্গার সময়ে থেকেক্রমান্বয়ে এই প্রক্রিয়া রাজ্যের সমস্ত সরকারি পরিচালন ব্যবস্থাকে কুক্ষিগত করেছে। এমনকী স্থানীয়ভাবে পারিবারিক ঝগড়া-ঝাঁটিতে অংশ নিয়েছে। বিশেষ করে শিক্ষাকে দল ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছে এবং সিপিএম সমস্ত চাকরি নিয়োগে প্রভাব খাটিয়েছে — তা পিওনই হোক কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদই হোক।

স্থানীয় প্রশাসনকে নিয়ন্ত্রণ করে দল রাজনৈতিকভাবে খুব ফায়দা লুটেছে। দল ক্রমান্বয়ে এক নির্বাচনী মেশিনে পরিণত হয়েছে। সাধু-অসাধু যে কোনও উপায়েই ক্ষমতা দখল করে এসেছে। বিরোধী কোনও দলই এ যাবৎ এই মেশিনারীর প্রতিদ্বন্দ্বিতার ধারে কাছে আসতে পারেনি।

এই পরিকাঠামোয় ততদিনই সাফল্য এসেছে যতদিন এদের ভয়ে লোক কাজ করবে তা সুনিশ্চিত ছিল। অবিভক্ত কংগ্রেসের ৪০ শতাংশের এক ভোট ব্যাঙ্ক ছিল যা বেশ ভালই, কিন্তু সংগঠিত ফ্রন্টের শক্তির কাছে তা কিছুই নয়। ১৯৯৭-র পরবর্তীকালে বহুধা বিভক্ত বিরোধীরা বামেদের কাজটাকে সরল করে দিল। নন্দীগ্রামে বাড়াবাড়ি, সিঙ্গুর নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর উচ্ছ্বসিত বাগাড়ম্বর গ্রামীণ ক্ষেত্রে ফ্রন্টের ভোট ব্যাঙ্কে চিড় ধরালো। মুসলিমদের বিদ্রোহ, সঙ্গে উগ্র মাওবাদীদের আন্দোলন এবং সেইসঙ্গে কংগ্রেসের সঙ্গে মমতার কৌশলগত জোট প্রধান শত্রু শিবিরে ফাটল ধরালো। টি এম সি-কংগ্রেসের জোট নির্বাচনী পাটিগণিতে এক বড়-সড় চিড় ধরাতে সাহায্য করল। সর্বভারতীয় রাজনীতি বাদবাকিটা সম্পন্ন করলো।

তাদের নিয়ন্ত্রণের কাঠামো যে আসলে তাসের ঘর, ফ্রন্টের তাৎক্ষণিক পরাজয় তা প্রমাণ করল। অনেকে যারা সুবিধা ভোগের জন্য পার্টি করতো এই জোয়ারে তারা তাদের জার্সি খুলে ফেলল, এমনকী পালা-বদলের সুযোগে কিছু আমলাও ধীরে ধীরে আনুগত্য পাল্টাতে শুরু করলো। মমতার ছাতার আড়ালে মাওবাদীরা এবং বাম অনুগামী বুদ্ধিজীবীরা ধীরে ধীরে সিপিএমের সঙ্গে সম্পর্ক ভেঙে গ্রাম বাংলায় তাদের ভিত্তি দৃঢ় করতে শুরু করলো। মুসলিমদের একাংশ যারা নিজেদের স্বার্থে সি পি এম পরবর্তী জমানাতে নিজেদের অবস্থানকে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা গত কিছুদিন ধরে করতে শুরু করেছে এ রাজ্যে আগে তা কখনও দেখা যায়নি। এই মুহূর্তে সংখ্যালঘুরা হয় কংগ্রেসের সঙ্গে নয়তো তৃণমূল শিবিরে।

মূলত দুটো কারণে বামেদের এই পঙ্গুদশা। প্রথমত, নীতিবাগীশ কমরেডরা লক্ষ্য করেছে যে, বর্তমানে ক্যাডাররা হয় ভাড়াটে গুন্ডা নয়তো সুবিধাবাদী। তাদের দল বহিষ্কার করেছে। কিন্তু তাদের এই বহিষ্কার দলের নির্বাচনী যন্ত্রকে খতম করে দিয়েছে। দ্বিতীয়ত লোকসভা নির্বাচন আসলে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের উন্নয়ণ রাজনীতির এক ব্যক্তিগত পরাজয়। এবারের নির্বাচনী রায় তা প্রমাণ করেছে। রাজ্য সরকার যে শিল্পের নামে জমি অধিগ্রহণ করেছে তা আমজনতা দ্বারা প্রত্যাখ্যাত। অপারেশন বর্গায় সুবিধাভোগীরা এই প্রজন্মেই তাদের অধিকৃত জমি দিতে নারাজ।

বাইরের জগতে এইসব ঘটনা ভয়ঙ্কর। ১৯৬৭ সাল থেকে এই রাজ্য পরিচিত হয়ে এসেছে এক জঙ্গী, মাত্রাতিরিক্ত রাজনীতি এমনকী অরাজক এক রাজ্য হিসেবে। মনে হতে পারে এগুলি গতানুগতিক কিন্তু তা বাস্তব এবং দেশের উন্নয়ণের তালে পা মেলাতে অপারগ এক রাজ্য। ক্ষণিকের জন্য মনে হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যটাকে উন্নয়ণের দিশা দেখাচ্ছেন। কিন্তু এখন তা কেবলই মরীচিকা। সিপিএমকে বিতাড়নে মমতার প্রচেষ্টাকে মনে হতে পারে এক গুঁয়েমি এবং অসম্ভব। একটা ধারণা প্রচলিত যে, এই প্রক্রিয়া হবে হিংসাত্মক। উপসংহারে বলা যায় যে, সিপিএম যত দুর্বল হবে তত মাওবাদীদের সন্ত্রাস এক অতিরিক্ত সমস্যা হিসাবে গ্রাস করবে রাজ্যকে এবং বাড়বে মুসলিম সাম্প্রদায়িক রাজনীতি।

হতে পারে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পালাবদল অনিবার্য এবং বাম জমানা শেষ হবে। কিন্তু এই পরিবর্তন খুবই ধবংসাত্মক। কমপক্ষে দূর থেকে দেখলে এমনটাই মনে হয়।

(টেলিগ্রাফ-এর সৌজন্যে)

একশো দিনের কাজ

এবারও রাজ্য ব্যর্থতার পথে

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। গত বছর একশো দিনের কাজ প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গ সরকার চরম ব্যর্থ হয়েছিল। এবারেও সেই ঐতিহ্য বজায় রাখতে চলেছে রাজ্য সরকার। গত বছর এই প্রকল্পে রাজ্য সরকার কাজ দিতে পেরেছিল জনপ্রতি গড়ে ১৪দিন। এবছর এখনও পর্যন্ত গড়ে মাত্র কুড়ি দিন কাজ জুটেছে দারিদ্র্য সীমার নিচে থাকা মানুষদের।

সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে একশো দিনের কাজ প্রকল্পের রাজ্যওয়ারি যান্মাসিক মূল্যায়ণ হয়েছে। সেই মূল্যায়ণে উঠে এসেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অবস্থাটি। পশ্চিমবঙ্গে রাজ্যের ৯৩৮টি গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকায় কোনও ব্যাঙ্কের শাখা নেই। এজন্য বি পি এল তালিকাভুক্ত মানুষের নামে কোনও অ্যাকাউন্ট খোলাই সম্ভব হয়নি।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার সবসময় উন্নয়ণের গল্প শোনালেও গ্রামের মানুষ উন্নয়ণ থেকে বঞ্চিত। ৩২ বছর রাজ্য শাসনের পরেও কোথাও সেচ নেই, কোথাও পানীয় জল নেই। রাজ্য মানব উন্নয়ণ রিপোর্ট তথ্য অনুযায়ী রাজ্যের ৩৪১ টি ব্লকের মধ্যে ৮২টি ব্লকে ন্যূনতম খাবার জোটে না। ১৪৭টি ব্লকে বছরের অর্ধেক সময় খাবার অমিল। পশ্চিম মেদিনীপুরের গোপীবল্লভপুরে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে অনুন্নয়ণ। এই এলাকার বিধায়ক মন্ত্রী রবিলাল মৈত্র। ২০০৭-০৮ সালে বিধায়ক এলাকা উন্নয়ণের জন্য পান ৩৯ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা। ১৫টি প্রকল্পের জন্য বিধায়ক কোটা থেকে তিনি ঐ টাকা পান। এর মধ্যে ৮টি প্রকল্পের কাজ শেষ করতে পেরেছেন তাই ২০০৮-০৯ তে কোনও টাকা পাননি। ২০০৭-০৮ সালে জলসম্পদ উন্নয়ণ মন্ত্রী পেয়েছেন ৩০ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। তিনি নাকি১৫ লক্ষ টাকা খরচ করেছেন, যদিও ৩১ আগস্ট পর্যন্ত জেলা প্রশাসনের কাছে ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট জমা পড়েনি। পরিসংখ্যান বলছে নারায়ণগড় থেকে জেতা মন্ত্রী সূর্যকান্ত মিশ্র ২০০৭-০৮ সালে বিধায়ক কোটার ৪০ লক্ষ টাকা পেয়েছেন। অথচ কোনও কাজ করতে পারেননি। তাই ২০০৮-০৯ সালে বিধায়ক উন্নয়ণ প্রকল্পের এক টাকাও তিনি পাননি। ঐ একই অবস্থা পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্যদের মন্ত্রী সুশান্ত ঘোষের।

সীমান্তে নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করা হোক

(১ পাতার পর)

অসফল প্রয়াস করতে ছাড়েনি।

এই সময়ে সঙ্ঘের কার্যকরী মন্ডল সরকারকে ১৯৬২ সালের ১৪ নভেম্বর সংসদে ঐক্যমতে গৃহীত সর্বদলীয় প্রস্তাবকে স্মরণ করিয়ে দিতে চায়। সেই প্রস্তাবে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছিল চীন কর্তৃক দখলীকৃত ভারতভূমি উদ্ধারে সরকার সচেষ্ট হবে। সেজন্য ভারত সরকারকে চীনকে বলতে হবে যে, তারা পশ্চিম সেক্টরে আমাদের যে ভূখণ্ড দখল করেছে তা খালি করে দিতে হবে এবং অন্যত্রও চীনা কর্তৃত্বের দাবী তোলা বন্ধ করতে হবে। ভারতের সঙ্গে চীন ও মায়ানমারের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সীমানা হিসেবে ম্যাকমোহন লাইনকে মেনে চলতে হবে।

এটা অত্যন্ত দুশ্চিন্তাজনক যে চীন কাশ্মীর ও অরুণাচলবাসী ভারতীয়দের আলাদা হিসেবে ভিসা দিচ্ছে। এই উস্কানিমূলক ব্যবহার করে চীন অরুণাচল ও কাশ্মীরকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে অস্বীকার করতে চায়। কার্যকরী মন্ডল ভারত সরকারের অভিবাসন কর্তৃপক্ষকে ওই সব চীনা ভিসা বাতিল করতে আহ্বান জানিয়েছে, তারা দেশছাড়ার আগেই। ভবিষ্যতে এরকম অবাঞ্ছিত ঘটনা রোধে কড়া পদক্ষেপ আক্রামক কূটনীতিই চীনের ক্ষেত্রে ভারত স্বার্থ রক্ষাকারী সুফল এনে দিতে পারে। কার্যকরী ভারত-পাক সীমান্তেও ওরকমই আক্রমণাত্মক মনোভাব গ্রহণের পক্ষপাতী। এক্ষেত্রে মিশরের শার্ম-আল-শেখ-এ দু'দেশের প্রধানমন্ত্রীর ৯ জুলাই, ২০০৯-এর যৌথ বিবৃতি পীড়াদায়ক। দলমত নির্বিশেষে অনেক নেতাও বিশেষজ্ঞরা পাকিস্তানের ক্রমাগত সীমা পার সন্ত্রাস সত্ত্বেও আলোচনা শুরু ও বালুচিস্তান পাক-বিরোধিতায় ভারতের উপস্থিতির স্বীকৃতিকে চূড়ান্ত কূটনৈতিক ব্যর্থতা বলেই মনে করেন। এ বিষয়ে কার্যকরী মন্ডল দাবী করছে যে, ভারত সরকার যেন ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৪-এ সংসদে গৃহীত সর্বসম্মত প্রস্তাব স্মরণ করিয়ে দিতে চায়। ওই প্রস্তাবে পাক অধিকৃত কাশ্মীরকে মুক্ত করাই একমাত্র সমস্যা বলে বলা হয়েছিল।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কার্যকরী মন্ডল যে সকল সেনা এবং অফিসাররা ভারতের ভৌগোলিক সীমান্তরক্ষায় সদা সতর্ক তাদেরকে অভিনন্দন জানায় এবং একই সঙ্গে সকল দেশবাসীকে সদা জাগ্রত থেকে সরকারকে দেশের একতা ও অখণ্ডতা রক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণে সচেষ্ট ও সক্রিয় করতে আহ্বান জানায়।

টনক নড়ল কেন্দ্রের

(১ পাতার পর)

না। বি ডি আর এক্ষেত্রে বি এস এফ-এর কাছে ফেরৎ পাঠানো বাংলাদেশীদের নাম-ঠিকানার প্রমাণপত্র দেখতে চাইছে। কিন্তু বি এস এফ-এর কাছে এসব প্রমাণপত্র থাকা সম্ভব নয়। কেননা বাংলাদেশীরা এদেশে ঢুকে ধরা পড়ে আদালতে বা ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালে ভারতীয় হওয়ার প্রমাণ দিতে পারেনি। সে দায় তাদের। অথচ বি ডি আর বাংলাদেশে ঢুকতে দিতে একটুও রাজী নয়।

এদিকে ঠেলায় পড়েই অসম রাজ্য সরকার কেন্দ্রের শরণাপন্ন হয়েছে। ২৪,০০০ বাংলাদেশীকে ফরেনার্স ট্রাইব্যুনাল বিদেশী বলে বহিষ্কারের নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু তাদেরকে কোথাও আটক বা বন্দী করে রাখার ব্যবস্থা না করাতে ২২ হাজার বাংলাদেশীই অসমের জনারণ্যে হারিয়ে গিয়েছে। এখন গুয়াহাটি হাইকোর্ট তাদেরকে খুঁজে বের করার জন্য কড়া নির্দেশ দিয়েছে। বিশ্বস্ত সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদ অনুযায়ী ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বাংলাদেশীদের বহিষ্কার নয়, পুশব্যাক করবে।

কেন্দ্র সরকার আগামী ২০১১ সালের জনগণনার আগে ত্রিপুরা, বাংলা ও অসমে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা কত তা জানতে চাইছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ, অসম ও ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের কাছে কেন্দ্র থেকে জানতে চাওয়া হবে — ২০০১ সালের পর থেকে অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা কত এবং বছরে অনুপ্রবেশের হার কত। সম্পূর্ণ ও সঠিক পরিসংখ্যান যে পাওয়া সম্ভব নয় তা কেন্দ্রও জানে। সেজন্য আনুমানিক কোনও হিসাব তৈরি করে সেটাকেই রিপোর্ট আকারে পাঠাতে বলা হবে। জনগণনার নির্ধারিত বছর ২০১১ সাল হলেও দু'বছর আগে থাকতেই এই প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। পাঁচটি রাজ্যে ইতিমধ্যে তথ্য সংগ্রহের কাজ চলছে। বাকী রাজ্যেও ধীরে ধীরে শুরু হবে। রাজ্যগুলির জনসংখ্যা যাতে সঠিকভাবে নথিভুক্ত হয় সেজন্য ঠিক হয়েছে, সর্বাগ্রে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা জানা দরকার। কারণ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক জানে, সারা দেশে কোটি কোটি এরকম বাসিন্দা আছে যারা স্থায়ী ভারতবাসী হিসেবে গণ্য হলেও আদতে তারা কোনও না কোনও সময়ে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত পেরিয়ে এদেশের মাটিতে ঢুকে পড়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও অসমে এই লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশীদের অনেকেই রাজনৈতিক প্রভাবে রেশন কার্ড পেয়ে গেছে। ফলে, বিগত ১৫/২০ বছরে লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশী ভারতবাসী হিসাবে বসবাস করছে। তাদের চ্যালেঞ্জ করা বা চিহ্নিত করা বেশ দুষ্কর।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক জানিয়েছে, এবার জনগণনার সঙ্গেই চলবে ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্টার এবং মাল্টি পারপাস ন্যাশনাল আই-কার্ড তৈরি করা। এই রেজিস্টারের মাধ্যমে কেন্দ্র সরকার চাইছে তাবৎ পরিসংখ্যান সারা দেশের নেটওয়ার্কিং ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করতে। অর্থাৎ একরাজ্যে বসে অন্য রাজ্যের ঠিকানা ও তথ্য দেখা যাবে। যদি একটি রাজ্যের মানুষ, অন্য রাজ্যে যায়, সেক্ষেত্রেও তার প্রকৃত পরিচয় ওই কার্ড এবং রেজিস্টারের মাধ্যমে সর্বত্রই প্রমাণ করা সম্ভব। এজন্যই বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের আনুমানিক সংখ্যা জানতে চায় কেন্দ্র।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সূত্রে খবর হল, শুধু বেআইনীভাবে সীমান্ত পেরিয়ে এদেশে ঢুকে মূলস্রোতে মিশে যাওয়াই প্রধান সমস্যা নয়। গত ২০ বছরে লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশী বৈধ পাসপোর্ট, ভিসা নিয়ে এদেশে ঢোকার পর আর ফিরেই যায়নি। ফলে বাংলাদেশী নিয়ে কেন্দ্রের মাথাব্যথা বাড়ছে বই কমছে না।

নন্দীগ্রামের খেলাই লালগড়ে

(১ পাতার পর)

করা হয়। কিন্তু বুদ্ধ বাবু সেদিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতরে চিঠি পাঠিয়ে আপত্তি জানিয়ে ছিলেন। ফলে বেসরকারি সংস্থাটি অনুরোধ ফিরিয়ে নেয়। হ্যাঁ, বুদ্ধ বাবু দলদাস স্তাবক আমলাদেরই পছন্দ করেন। যোগ্যতা বা কর্মদক্ষতা, সততা এসবে একেবারেই বিশ্বাস করেন না। নন্দীগ্রামে গুলি চালাবার হুকুম বুদ্ধ দেববাবুই দেন। কিন্তু পরে বিপাকে পড়ে সব দোষ তিনি তদানীন্তন স্বরাষ্ট্র সচিবের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছিলেন।

নন্দীগ্রামের সেই পুরানো খেলাই তিনি লালগড়ে খেলছেন তাঁর বশংবদ আমলাদের শিখন্ডী খাড়া করে। ছত্রধরের সঙ্গে মাওবাদীদের গভীর যোগাযোগ আছে বলে রাজ্য সরকার দাবী করলেও আজ পর্যন্ত এই ব্যাপারে সি আই ডি কোনও তথ্যই আদালতে পেশ করতে পারেনি। যেমন, ছত্রধরের কোটি টাকার বিমা, সম্পত্তি, ব্যাঙ্কে লক্ষ লক্ষ টাকার হদিশ সবই নাকি পুলিশ পেয়েছে। এমন দাবী রাজ্য পুলিশের প্রধান কর্তা কলকাতায় সাংবাদিকদের বলেছেন। অথচ আদালতে পুলিশ এই দাবীর সমর্থনে একটি কথাও বলেনি। কেন? তবে কি এটা বিভ্রান্তি ছড়াতে প্রচার করা হচ্ছে? কে জবাব দেবে? উল্টে আদালত কেন্দ্রীয় সন্ত্রাসবাদ দমন আইনে ছত্রধরের গ্রেফতারের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। কারণ, এই কেন্দ্রীয় আইনটি রাজ্যে প্রয়োগ করার আগে আইনের তিন এবং চার নম্বর ধারা অনুসারে সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করতে হয়। সরকারি বিজ্ঞপ্তিটি আজও জারি করা হয়নি। তাই এই আইনে গ্রেফতার করা যায় না। বুদ্ধ বাবুর দলদাস আমলারা বয়ান দিয়েছেন যে কেন্দ্রীয় আইনটি সারা দেশেই প্রযোজ্য। এর জন্য আলাদা করে রাজ্য সরকারের বিজ্ঞপ্তি জারি করার প্রয়োজন নেই। এই বয়ান অসত্য এবং বিভ্রান্তিকর। যেমন, যদি ছত্রধরের পুলিশি সন্ত্রাসবিরোধী জনসাধারণের কমিটি আদতে মাওবাদীদের প্রথমসারির সংগঠনই হয় তবে রাজ্য সরকার এই সংগঠনকে আজও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেনি কেন? মাওবাদী হোক বা মার্কসবাদী;হিংসার রাজনীতি ঘৃণ্য। ভারতের মাটিতে হিংসা ও প্রতিহিংসার রাজনীতির স্থান নেই। তাই জনসাধারণের কমিটি যদি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মাওবাদীদের হিংসার রাজনীতির সমর্থক হয় তবে অবিলম্বে বিচারাধীন মামলা চলাকালীন মহাকরণে বসে দলদাস আমলাদের বিভ্রান্তিকর বয়ানও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। আদালতে বিচারের আগেই তাঁরা অভিযুক্তকে দোষী বলে ঘোষণা করে দিলেন কোন স্বার্থরক্ষায়? কেনই বা মুখ্যমন্ত্রী বা তাঁর পার্টির অন্য মন্ত্রীরা মুখে কুলুপ এঁটেছেন। তবে কি মুখ্যমন্ত্রী নয়, আমলারাই এখন রাজ্যের প্রশাসন চালাচ্ছেন?

রাজ্য রাজনীতি

সিপিএম-কংগ্রেসের ভাঙা সংসার জোড়ার পথে

নিশাকর সোম

এবারে রাজ্য-রাজনীতির অঙ্গনে তাৎপর্যপূর্ণ বহু ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে একটি প্রধান রাজনৈতিক ঘটনা ঘটেছে যার প্রভাব ভারতীয় রাজনীতিতে পড়বেই। কয়েকটি রাজ্যে উপনির্বাচনে বিজেপি-র শক্তি কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাওয়াতে এবং অন্ধ্র-এর প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রীর পুত্রকে সিংহাসনে না বসতে দেওয়ার দরুণ সোনিয়া গান্ধীর কুশপুত্তলিকা দাহ-সহ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ-এ কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বেশ কিছুটা ভীত হয়ে পড়েছেন। অপরদিকে এ-রাজ্যের সিপিএম, সিপিএম-এর সাধারণ সম্পাদকের নীতির বিরুদ্ধে কংগ্রেসের সঙ্গে পুরানো মৈত্রী কায়েম্ করার জন্য উদ্গ্রীব হয়েছেন। ফলে শিলিগুড়িতে সিপিএম-এর সমর্থনে কংগ্রেস পুরসভা দখল করে নিল। এরপরেই মমতা ব্যানার্জি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সমালোচনা করতে গিয়ে ঠারেঠোরে সোনিয়া গান্ধীর সমালোচনা করেছেন। এখন প্রশ্ন হল, এটা শুরু না শেষ? বিজেপি-এর শক্তি ও সংগঠন যত বেশি সংহত হবে, ততই কংগ্রেস-সিপিএম মৈত্রী মাখো মাখো হবে।

রাজ্যের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো — পুলিশী সন্ত্রাস বিরোধী জনগণের কমিটির নেতা ছত্রধর মাহাতোকে সাংবাদিক সেজে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

শোনা যাচ্ছে ছত্রধরকে গ্রেপ্তার করার পর পুলিশ নাকি "থার্ড ডিগ্রি" প্রয়োগ করে ছত্রধরের বিশাল বিত্তের খবর, মাওবাদীদের সঙ্গে তাঁর এবং "সুশীল সমাজের" যোগাযোগ তালিকা নাকি পাওয়া গেছে। এমনও খবর প্রকাশ পেয়েছে যে, লক্ষ লক্ষ টাকার সাহায্য ছত্রধর-এর কমিটির হাতে এসেছে। ছত্রধরের গ্রেপ্তারের পরমুহূর্তেমমতা ব্যানার্জি সিপিএম অস্ত্রধারীদের গ্রেপ্তারের দাবী তুলেছেন। তিনি হুমকি দিয়ে বলেছেন যে, যদি "সুশীল সমাজের" বুদ্ধিজীবীদের স্পর্শ করা হয় তবে আগুন জ্বলে উঠবে। আর এস পি নেতা তথা মন্ত্রী ক্ষিতি গোস্বামী ছত্রধরের গ্রেপ্তারকে অনৈতিক বলে সমালোচনা করেছেন। কিন্তু ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা অশোক ঘোষ মমতা ব্যানার্জির উক্তির তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের সঙ্গে রাজ্যের শাসক বিরোধী কার্যকলাপের নিন্দা করে বলেছেন, জনগণ এর জবাব দেবেন। সিপিআই-এর কেন্দ্রীয় নেতা তথা রাজ্যের মন্ত্রী নন্দগোপাল ভট্টাচার্য মমতার বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করে বলেছেন যে তিনি তো আগুন লাগিয়ে বসে আছেন, এখন হয়তো দাবানল সৃষ্টি করবেন।

> **"সিপিএম-এর রাজ্য নেতৃত্ব অর্থাৎ বুদ্ধ দেব-নিরুপম-বিমান কার্যত কংগ্রেসের সঙ্গে ভেঙে যাওয়া সম্পর্ক গড়ে তুলতে আগ্রহী। কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে এ রাজ্যের সিপিএম-এর কয়েকজন নেতার নিয়মিত যোগাযোগ আছে। তাই বলি, শিলিগুড়ির ঘটনা বিচ্ছিন্ন নয়।"**

উল্লেখ্য, কলকাতা পুরসভা নির্বাচন এবং বিধানসভা নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে ততই বামফ্রন্টের মধ্যে সিপিএম বিরোধিতা কমে যাচ্ছে এবং সিপিএম-এর পাশে ইতিমধ্যেই সিপিআই-ফরওয়ার্ড ব্লক দাঁড়িয়ে গেছে। বামফ্রন্টের একাধিক মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধ দেব ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখছেন। আর এস পি নেতা তথা পূর্তমন্ত্রী ক্ষিতি গোস্বামী বলেছেন, বুদ্ধ বাবু কোর কমিটির সভা ডাকেন না। মন্ত্রিসভার কোনও বিষয় আলোচনা না করে নিজের একক সিদ্ধান্তে কাজ করেন। সিপিএম একলা চলার নীতি নিয়ে চলার ফলে বিপদে পড়ছে। সিপিআই-এর কেন্দ্রীয় নেতা তথা মন্ত্রী নন্দগোপাল ভট্টাচার্য বলেছেন, বুদ্ধ বাবু — নিজের মতো করে কাজ চালাচ্ছেন। এ ব্যাপারে বামফ্রন্টে আলোচনা হওয়া উচিত।

তবে ক্ষিতিবাবু নিয়মিতভাবে মন্ত্রিসভার সমালোচনা করে চলেছেন। তিনি ক্যাবিনেট মিটিং-এ বলেছেন, "লালগড়, এনায়েতপুরের ঘটনায় মুখ পুড়েছে।" তবে ক্ষিতিবাবু যতই চিৎকার করুক না কেন, সিপিএম-কে এবং বামফ্রন্ট-কে ছেড়ে আর এস পি বেরিয়ে আসার সাহস দেখাতে পারবে না। যেমন অশোক ঘোষ এক সময় মমতা-কে আমাদের নেত্রী বলেছিলেন। আর আজ বলছেন, মমতাকে জনগণ জবাব দেবে। উল্লেখ করা প্রয়োজন, ফরওয়ার্ড ব্লকের ১৬ তম পার্টি কংগ্রেসে এক কোটি টাকা খরচ হবে। সিপিএম-কে বিরোধিতা করে কি এই টাকা সংগ্রহ করা সম্ভব?

সিপিএম-এর রাজ্য নেতৃত্ব অর্থাৎ বুদ্ধ দেব-নিরুপম-বিমান কার্যত কংগ্রেসের সঙ্গে ভেঙে যাওয়া সম্পর্ক গড়ে তুলতে আগ্রহী। কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে এ রাজ্যের সিপিএম-এর কয়েকজন নেতার নিয়মিত যোগাযোগ আছে। তাই বলি, শিলিগুড়ির ঘটনা বিচ্ছিন্ন নয়। অরুণাচলে তো কংগ্রেস-তৃণমূল পরস্পরে লড়ে যাচ্ছে! ২০১১ সালের আগেই কেন্দ্রে এবং রাজ্যে বহু রাজনৈতিক বাঁক বা রাজনৈতিক সুতো পাকানোর ঘটনা দেখা যাবে।

পার্টি সংগঠন বনাম মন্ত্রিসভা — অর্থাৎ বুদ্ধ বনাম বিমান বসু দ্বন্দ্বের বর্তমান অবস্থা হল ১:১। অর্থাৎ বিমানবাবুকে পার্টির মুখপাত্র থেকে সরিয়ে দিয়ে বুদ্ধ বাবুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু সেলিমকে পার্টির মুখপাত্র করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে সেলিম-কে গুরুত্ব দেওয়া হবে কারণ সেটাই বুদ্ধ বাবুর আকাঙ্ক্ষা।

যদিও বুদ্ধ বাবুর সঙ্গে শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেনের লড়াই চলছে। যার ফলে নিরুপমবাবুর সাধের অন্ডালের বিমান-নগরের প্রকল্প-কে বুদ্ধ বাবু বাতিল করে দেবেন। রাজ্য সিপিএম-এর মধ্যে বর্ধমান গোষ্ঠী নিরুপম সেন-কে মুখ্যমন্ত্রী অথবা রাজ্য পার্টির সম্পাদক পদে আসীন করার জন্য এখন থেকেই কোমর বেঁধে নেমে

(এরপর ৬ পাতায়)

অন্য রকম

চলন্ত হাসপাতাল

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। অসুস্থ হলে রোগীই ছুটে যান হাসপাতালে। চিকিৎসার জন্য দৌড়ান এক ডাক্তার থেকে অন্য ডাক্তারের দোয়ারে। চটজলদি সুস্থ হতে কত দেখেছেন এসব নিয়ে দিব্যি খবরের স্টোরি করা যায়। পাঠকেরাও পড়েন। সিনেমাও হয় এদের নিয়ে। কিন্তু এদের জন্য ভাবার লোক কম। সঞ্জয় হাজারিকা তাদের কাছের মানুষ হতে চেয়েছিলেন। এক অনগ্রসর শ্রেণীর মহিলাকে নৌকার অভাবে বিনা চিকিৎসায় মরতে দেখেছিলেন তিনি। এই হাসপাতালই পৌঁছে যায় রোগীর কাছে। যাতে সব ধরনের চিকিৎসা হয় চটজলদি। নৌকাতেই রয়েছে ডাক্তার, ওষুধ, অপারেশন থিয়েটার সহ অত্যাধুনিক চিকিৎসার সবরকম ব্যবস্থা।

ডিব্রুগড় ২০০৫ সাল পর্যন্ত অনগ্রসর জেলার তালিকায় শীর্ষে ছিল। পরিস্থিতি

আখা হাসপাতালের সামনে ডিব্রুগড়বাসীরা।

কি না করতে হয় রোগীকে। কিন্তু তাই বলে কী হাসপাতাল কখনও ছুটে যায় রোগীর কাছে! তবে অসমের ডিব্রুগড়ের চিত্রটা অনেকটা সেরকমই। এখানে 'আখা' হাসপাতালই যেন পৌঁছে যায় রোগীদের কাছে। সঞ্জয় হাজারিকা নামে বিশিষ্ট সাংবাদিক নিজেই চিকিৎসার উপকরণ নিয়ে রোগীদের সামনে উপস্থিত হন।

২০০০ সালে এমন হাসপাতাল গড়ার কথা প্রথম মাথায় আসে তাঁর। সাংবাদিকতার লাইনেই ডিব্রুগড়কে খুব কাছ থেকে দেখেছেন তিনি। ব্রহ্মপুত্র নদী তটের মানুষগুলোর সহজ-সরল জীবনই সঞ্জয়কে প্রেরণা যোগায়। এখানকার দারিদ্র্যক্লিষ্ট মানুষগুলোর জন্য কিছু করতে চেয়েছিলেন তিনি। বহুবার ঘুরে গেছেন ব্রহ্মপুত্র তটে। ঘটনায় মর্মাহত হন সঞ্জয়। মনে মনে ঠিক করেন আর না, এদের চিকিৎসার প্রয়োজন। তাদের কাছে অত্যাধুনিক চিকিৎসার খুঁটিনাটি পৌঁছে দিতে নৌকার ওপর গড়ে তোলেন একটা পুরো হাসপাতাল। নাম রাখেন 'আখা'। অসমীয়ার আখা-র বাংলা অর্থ আশা। জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন (এন আর এইচ এম)-এর সহযোগিতায় গড়ে তোলেন নৌকা হাসপাতাল।

চিকিৎসা ব্যবস্থাও বেশ বিচিত্র। অসুখের খবর শুনলে হাসপাতালই ছুটে আসে রোগীর কাছে। ব্রহ্মপুত্র নদীর উপর ছোটো বড় দ্বীপের অধিবাসীদের কাছে পৌঁছে যায় সঞ্জয়ের হাসপাতাল। ডাক্তাররা যাতে রাত্রিবাস করতে পারেন, হাজারিকা তারও যথেষ্ট ব্যবস্থা রেখেছেন। নৌকাসহ গোটা এখনও যে খুব উন্নত হয়েছে তা নয়। বন্যায় ঘরবাড়ি হারানো মানুষগুলোর জন্য সঞ্জয় কিছু না করুক, অত্যাধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা পৌঁছে দিয়েছেন। এন আর এইচ এম-এর পক্ষ থেকেও সঞ্জয়ের নৌকা হাসপাতালের প্রশংসাও করা হয়েছে। বিশ্ব ব্যাঙ্ক ২০০৪ সালে এই প্রজেক্টকে সম্মানিত করে।

সঞ্জয় হাজারিকা তাঁর জীবনে ডিব্রুগড়বাসীদের চিকিৎসার কথা বারবার ভেবেছেন। তাঁর ভাবনা যথেষ্ট সম্মানিতও হয়েছে। তিনিই প্রথম দেখান সদিচ্ছা থাকলে হাসপাতালকেও রোগীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়।

গু

ডি এইচ ডি-র আত্মসমর্পণ

৫০ কোটি টাকায় শান্তি কিনলেন গগৈ

হাফলং থেকে ফিরে বাসুদেব পাল ।। স্থান — অসমের উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলার সদর শহর হাফলং-এর ডি এস এ (ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস এসোসিয়েশন) ময়দান। তারিখ, ২রা অক্টোবর, ২০০৯ — মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে ইংরেজ পরবর্তী অধ্যায়ে এক নতুন যুগের সূচনা হল এদিন। উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলায় দাপিয়ে বেড়ানো ডি এইচ ডি অর্থাৎ ডিমা হালাম দাওগা জঙ্গি দলের জুয়েল গার্লোসা গোষ্ঠীর সশস্ত্র জঙ্গিরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর হাতে অস্ত্র জমা দিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে অঙ্গীকার করল তাদের সেনা প্রধান নিরঞ্জন হোজাই-এর নেতৃত্বে। এই গোষ্ঠীটি ব্ল্যাক উইডো নামেই

নিরঞ্জন হোজাইকে জড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ।

বেশি পরিচিত বা কুখ্যাত বললে অত্যুক্তি হবে না। গগৈ-এর হাতে গোলাপ আর নিরঞ্জন হোজাই-এর হাতে অত্যাধুনিক এস এল আর (ম্যাগাজিন)। গগৈ দিলেন গোলাপ আর হোজাই দিলেন ম্যাগাজিন। তবুও জনমনে নানান প্রশ্ন। ঘটা করে এই লোক দেখানো আত্মসমর্পণ (?) আদৌ স্থায়ী হবে কি? কেননা অনুষ্ঠান চলাকালীনই জঙ্গিরা ও তাদের সমর্থকরা নানান দাবী সম্বলিত হ্যান্ডবিল উপস্থিত ছোট্ট শহরের সহস্রাধিক জনতার হাতে বিলি করছিল। তাতে ছোট জেলাটির ডিমাসা জনজাতি গোষ্ঠীর জন্য স্বাধীন রাজত্বের কথা না থাকলেও আগের অন্যান্য যাবতীয় দাবী-দাওয়ার কথা রয়েছে।

তবে অনুষ্ঠানে ব্যতিক্রম ছিল হাফলং-এর অবিসংবাদিত কংগ্রেস নেতা গোবিন্দ চন্দ্র লাংথাসার অনুপস্থিতি। এটা উপস্থিত জনগণ ও সংবাদ মাধ্যমের দৃষ্টি এড়ায়নি। দু'দিন ধরে হাফলং শহরে ঘোরাঘুরি করে সাধারণ ও প্রতিষ্ঠিত কিছু নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল ডি এইচ ডি-র উৎপত্তি ও জন্মের সঙ্গে লাংথাসা জড়িত ছিলেন বলেই তারা বিশ্বাস করেন। লাংথাসা এর আগের গগৈ মন্ত্রীসভায় পশুপালন মন্ত্রী ছিলেন। ২০০৩ সালের শুরুতেই উত্তর কাছাড়ের সর্ববৃহৎ স্বধর্মনিষ্ঠ জনগোষ্ঠী ডিমাসাদের (জেলার মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫০ শতাংশ) সঙ্গে খৃষ্ট মতাবলম্বী মার ছণ্ড্রস্থ্রজগ্ন-দের জাতি দাঙ্গা হয়েছিল। হাফলং-এর লাগোয়া মার বস্তির খৃস্ট-মতাবলম্বী লোকেরা ডিমাসাদের উপর চড়াও হয়। কয়েক হাজার গরীব ডিমাসা জনজাতির লোকেরা বাস্তুচ্যুত হয়ে ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিল। সে সময় ডিমাসা মহিলা সমিতি গোবিন্দবাবুর বাড়িতে দেখা করতে গেলে তিনি তাদের মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দেন। তবে গোবিন্দ লাংথাসা ডিমাসা সমাজেও ধিকৃত ও নিন্দিত হন। সন্ত্রাস ছিনিয়ে নিয়েছে তাঁর দুই ছেলেকে। পুরুষানুক্রমে উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলার স্বশাসিত পরিষদে বেশির ভাগ সময় লাংথাসা পরিবার ক্ষমতা ভোগ করেন। জনতার মনোভাব আঁচ করতে পেরেই গোবিন্দ লাংথাসাকে গগৈ সঙ্গে রাখার ঝুঁকি নেননি।

বিগত স্বশাসিত পরিষদ নির্বাচনে (ডিসেম্বর-২০০৮) বিজেপি ও এ এস ডি সি যৌথভাবে জিতে ক্ষমতা দখল করে। তারপরই চীফ এক্সিকিউটিভকে হঠানোর নানা চক্রান্ত হয়। পরিণতিতে মোহিত হোজাই ডি এইচ ডি জঙ্গিদের বিপুল পরিমাণ টাকা দিতে গিয়ে ধরা পড়ে এখন জেলে। আর সেই সুযোগে রাজ্য সরকার বোর্ড গঠন না করে নিজেদের হাতে ক্ষমতার রাশ তুলে নিয়েছে।

সম্ভবত আত্মসমর্পণকারী জঙ্গি নেতাদের হাতে ক্ষমতার হস্তান্তর করতেই এই টালবাহানা। যদিও ইতিমধ্যে স্বশাসিত পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বেশির ভাগই কংগ্রেস দলে যোগ দিয়েছে।

জুয়েল গার্লোসার নেতৃত্বে 'ব্ল্যাক উইডো' জঙ্গিরা (ডি এইচ ডি) গত মার্চ-এপ্রিল থেকেই বরাক উপত্যকার লাইফলাইন বলে পরিচিত বদরপুর-লামডিং লাইনে যাত্রীবাহী ও মালবাহী ট্রেনে গুলি চালিয়ে যাত্রী, নিরাপত্তারক্ষী ও রেলকর্মীদের হতাহত করে চলেছিল দিনের পর দিন। এখনও এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত শিলচর -বদরপুর-লামডিং লাইনে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়নি।

এদিকে ডি এইচ ডি (জুয়েল গার্লোসা)-র প্রাক্তন সেনাপ্রধান নিরঞ্জন হোজাই হাটে হাঁড়ি ভেঙে বলে দিয়েছেন যে, ব্ল্যাক উইডোকে শিখণ্ডী খাড়া করে টাকা হাতিয়েছেন কংগ্রেস, বিজেপি, এ এস ডি সি সহ তাবৎ রাজনৈতিক দলের নেতারা। এই সব দলের নেতারা উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলার জন্য বরাদ্দ কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছেন। তাঁর আরও বক্তব্য — "যাতে এর পুনরাবৃত্তি না হয় তা দেখব। প্রয়োজনে স্বশাসিত পরিষদে আমাদের প্রতিনিধিত্ব থাকবে।" তবে তড়িঘড়ি প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে নামার কথা খোলাখুলি বলেননি নিরঞ্জন। এদিকে বরাক উপত্যকায় সর্বত্র কানাঘুষো আলোচনা চলছে — নিরঞ্জন হোজাইকে উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলার মুখ্য কার্যনির্বাহী পদে বসানো হতে পারে। তরুণ গগৈ বাইরে বিদেশ সফরে ব্যস্ত ছিলেন। সেজন্য ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে আত্মসমর্পণকৃত ৪১৬ জন্য ডি এইচ ডি (ব্ল্যাক উইডো) জঙ্গিকে হাফলং-এ নিয়ে এসে ২ অক্টোবর মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পণ-পর্ব ধূমধাম করে অনুষ্ঠিত হয়। মুখ্যমন্ত্রী ৫০ কোটি টাকার প্যাকেজও ঘোষণা করেন। এদিকে জঙ্গি নেতারা ডেজিগনেশন শিবিরে থেকেও রীতিমতো প্রেস বিবৃতি দিয়ে চলেছেন। সংবাদে প্রকাশ ৫ জুন দল নেতা জুয়েল গার্লোসা ব্যাঙ্গালোরে ধরা পড়ার পর ডি এইচ ডি (গার্লোসা)-কে চাপে ফেলে দেয় সেনা ও পুলিশ। নিরঞ্জন হোজাই চীনে আশ্রয় নেন। সেখানেই ফোনে তার সঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চিদাম্বরম্-এর পাকা কথাবার্তা হওয়ার পর আত্মসমর্পণ চূড়ান্ত হয়। তবে এখনও কি শর্তে আত্মসমর্পণ-তা প্রকাশ করা হয়নি।

নিরঞ্জন হোজাই ধৃত নেতাদের মুক্তি, সহকর্মীদের পুনর্বাসন ও উত্তর কাছাড়ের জন্য ভারতীয় সংবিধানের (২৪৪-এ) ধারার অধীনে পৃথক ডিমাসা রাজ্যের দাবী করেছেন। সময়সীমা ১০০দিন। ওই একশ দিন পার হলেই বোঝা যাবে সত্যিই শান্তি এল কি না! না, মুখ্যমন্ত্রী ৫০ কোটি টাকায় একশ দিনের শান্তির বাণিজ্য করলেন। এদিকে ডি এইচ ডি (নুনিসা)-র অপর গোষ্ঠী এই আত্মসমর্পণকে আদৌ গুরুত্ব দেয়নি। তাদের বক্তব্য সব ক্যাডার ধরা দেয়নি এবং অস্ত্রও সমর্পণ করেনি। জমা পড়েছে সর্বমোট ১৪৮টি আগ্নেয়াস্ত্র।

১৯৯৩ সালে নিরঞ্জন হোজাই, জুয়েল গার্লোসা ও দিলীপ নুনিসা মিলে ডি এইচ ডি জঙ্গি সংগঠনের সূত্রপাত করেন। ২০০৩ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর ডি এইচ ডি কেন্দ্র সরকারের সঙ্গে অস্ত্র বিরতি চুক্তি করে। কিন্তু জুয়েল গার্লোসার নেতৃত্বে একটা বড় সংখ্যক জঙ্গি লড়াই চালিয়ে যায়। ২০০৪-এ জুয়েল ব্ল্যাক উইডো গড়ে ওঠে। এরপরের ইতিহাসের প্রতিটি অধ্যায়ই রক্তরঞ্জিত। ভবিষ্যতই বলবে সেই অধ্যায় শেষ হল কি না।

পয়লাপুলে আরোগ্যরক্ষক প্রশিক্ষণ শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি।। কাছাড় জেলার লক্ষ্মীপুর মহকুমার পয়লাপুল হায়ার সেকেন্ডারী স্কুলে উত্তরপূর্বাঞ্চ ল সেবাভারতী এবং শিলচরের কেশব স্মারক সংস্কৃতি সুরভি'র যৌথ উদ্যোগে আরোগ্যরক্ষক প্রশিক্ষণ বর্গ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এই বর্গের উদ্দেশ্য হল প্রত্যন্ত গ্রামে, বিশেষত চা-বাগান এলাকায় গরীব জনজাতি ও সেই প্রশিক্ষিত আরোগ্যরক্ষকদের সুবিধা-অসুবিধায় পরামর্শ দেন। সেজন্য তাঁরা নিয়মিত পুরো বরাকভ্যালিতে সফর করেন। এই দায়িত্বে রয়েছেন করিমগঞ্জ জেলার রামকৃষ্ণনগরবাসী ডাঃ অচিন্ত্য নাথ।

শিক্ষার্থীদের ভোর চারটে থেকে রাত্রি দশটা পর্যন্ত ঠাসা কর্মসূচী। খেলাধূলা, স্তোত্রপাঠ, গীতাপাঠ ও চিকিৎসার প্রশিক্ষণ।

পয়লাপুলে চিকিৎসক ও শিক্ষার্থীরা।

এলাকায় বসবাসকারীদের কাছে ন্যূনতম চিকিৎসা পরিষেবা বিনামূল্যে পৌঁছে দেওয়া। এজন্য হোমিও-চিকিৎসকরা দশদিন যাবৎ যাবতীয় প্রশিক্ষণ দেন। প্রশিক্ষণের পর তাদেরকে বিভিন্ন এলাকাভিত্তিক হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দেওয়ার কাজে লাগানো হয়। সেবাভারতী নিঃশুল্ক ঔষধ যোগান দেয়। মাঝে মাঝে চিকিৎসকরা এই ডাঃ অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ অচিন্ত্য নাথ, দেবব্রত নাথ ও মহেন্দ্র দাস এই চারজন প্রশিক্ষণ দেন। শিবিরে ২২টি স্থান থেকে পঁচিশ জন শিক্ষার্থী যোগ দেন। কাছাড় জেলার লাগোয়া মণিপুরের জিরিবাম থেকে এসেছেন জনৈক শিক্ষক। শিক্ষার্থীদের মধ্যে বারোজন মা-বোনেরাও ছিলেন।

ভাঙা সংসার জোড়ার পথে

(৫ পাতার পর)

পড়েছে।

পার্টির শুদ্ধি করণের উপর জোর দিয়ে বিমান বসু যতই লিখুন না কেন, পার্টির নিচের তলার বড় অংশ মনে করে শুদ্ধি করণ শুরু হওয়া উচিত সর্বোচ্চ নেতৃত্ব থেকেই। তাঁদের মতে রাজ্য থেকে লোকাল কমিটি পর্যন্ত বহু নেতাকে পার্টি সভ্যপদের অযোগ্য বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রতিটি জেলাতেই নেতৃত্ব বদলাও - বুড়ো হঠাও অভিযান হচ্ছে। বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই অবস্থার অবস্থান পরিবর্তন না হলে নির্বাচনী ফলাফল একেবারেই অনিশ্চিত। তাই রাজ্য সিপিএম-এর নেতৃত্ব রাজ্যের কংগ্রেস-এর একাংশের সঙ্গে মৈত্রী বন্ধন গড়ে তোলার ব্যাপারে সক্রিয়।

সম্প্রতি প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের জন্য ফরম বিলি হচ্ছে। এই ফরম সংগ্রহ ২৯ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে। লক্ষ লক্ষ চাকরী - প্রার্থী ফরম সংগ্রহ করবেন। এখন এই ব্যবস্থা যদি কেবলমাত্র "নির্বাচনী চমক" হয়ে উঠে তবে রাজ্যে এক তীব্র আন্দোলন সৃষ্টি হবে আর এতে নেতৃত্ব দেবে সিপিএম-এর যুব কর্মীগণ।

শুদ্ধি করণের ব্যবস্থায় প্রায় প্রতিটি জেলায়, নেতৃত্ব বিরোধীদের পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হচ্ছে। হাওড়া, বীরভূম এর ঘটনাতো সিপিএম-এর মুখপত্রে প্রকাশ হয়েছে।

সিপিএম-এর শ্রমিক ফ্রন্টের নেতারা রাজ্য মন্ত্রিসভার কাজের তীব্র সমালোচনা করে চলেছেন। সিটু পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কাউন্সিল-এর সভায় উত্তর ২৪ পরগণার অমিতাভ নন্দী, কলকাতার অসীম ব্যানার্জি ও অন্যান্য প্রায় সব জেলায় সিটু সম্পাদকগণ তাঁদের প্রতিবেদনে রাজ্য মন্ত্রিসভা তথা পরোক্ষে মুখ্যমন্ত্রী ও শিল্পমন্ত্রীর তীব্র সমালোচনা করেছেন। তাঁদের বক্তব্য হল, মন্ত্রিসভার কাজকর্মের ফলে শ্রমিক কর্মচারীদের মধ্যে মন্ত্রিসভা তথা বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে এক নেতিবাচক মনোভাব গড়ে উঠেছে। এর ফলে এই ক্ষুব্ধ শ্রমিক কর্মচারীগণ বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন।

যে যতই বলুক না কেন, বুদ্ধ বাবু অনড় অচল। যতক্ষণ না ২০১১ সালে বামফ্রন্টের পতন হয়, বুদ্ধ বাবু ততক্ষণ তাঁর একক সিদ্ধান্তের কাজকর্ম চালিয়ে যাবেন — এটা নিশ্চিত। তিনি বস্তুত ভস্মলোচন-এ পরিণত হয়েছেন। আগেই এই কলামে লেখা হয়েছিল — সুভাষ চক্রবর্তীর অনুগামীরা নিজেদের মতোন করে চলছে। রমলার দেওয়াল লেখা এবং পার্টির আদেশে মুছে ফেলতে বাধ্য হওয়া। দেখা গেল অশনি সঙ্কেত কিসের?

বেসরকারি সমীক্ষাতেও পয়লা নম্বরে আকালি-বিজেপি জোটের পাঞ্জাব রাজ্য

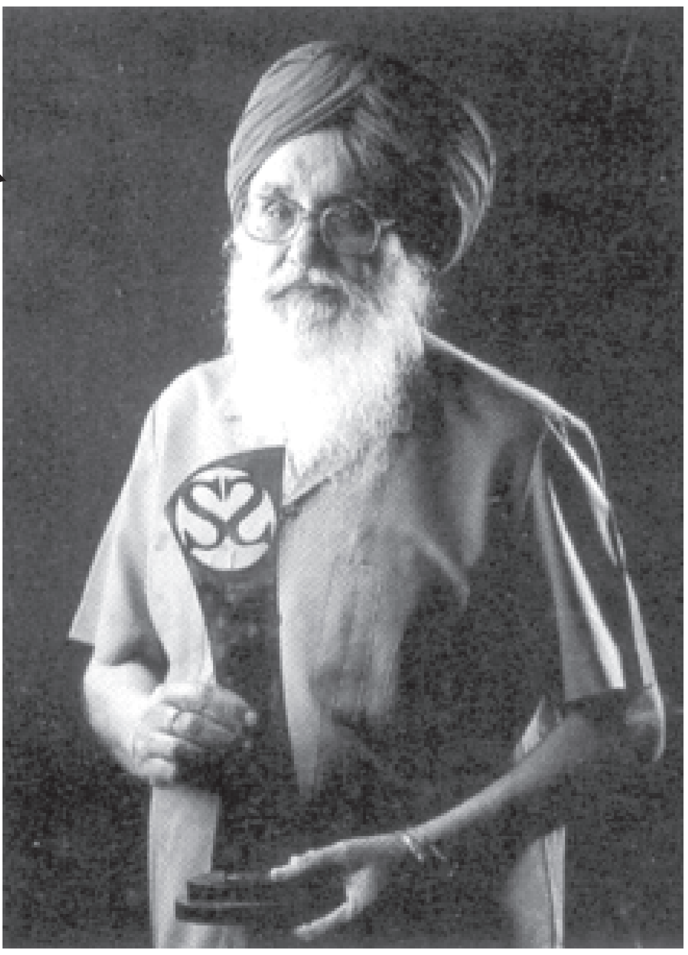

সেরা রাজ্যের ট্রফি হাতে পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ সিং বাদল।

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। মসনদে বসার আগে সব সরকারই ভুরি ভুরি প্রতিশ্রুতি শোনায় জনগণকে। ক্ষমতায় টিকে থাকার লক্ষ্যে সেসবের একটু আধটু রূপায়ণও হয়। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে, রাজ্যের উন্নয়ণ বলতে শুধু বিশেষ কোনও ক্ষেত্রের উন্নয়ণকেই বোঝায় না। তাঁদের মতে উন্নয়ণের মূল সংজ্ঞাটাই হলো সার্বিক উন্নয়ণ। ভারতের মতো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণই জনার্দন। ফলে জনমত বিরুদ্ধে গেলে সরকারকেও সরে যেতে হয়। এদেশে এমন রাজ্যও আছে, যেখানে প্রতি পাঁচ বা দশ বছর পর পর জনাদেশ পাল্টে যায়। ক্ষমতায় বসে নতুন সরকার। আবার এমন রাজ্যও আছে যেখানে দীর্ঘদিন একই সরকার মসনদে টিকে রয়েছে। পশ্চি মবঙ্গের নাম সেক্ষেত্রে সবার উপরে। তবে উন্নয়ণের ক্ষেত্রে সেইসব রাজ্যগুলিই এগিয়ে যেগুলিতে ক্ষমতার পালাবদল ঘটে।

সম্প্রতি 'ইন্ডিয়া টুডে' একটি রাজ্যওয়ারি সমীক্ষা চালায়। ওই সমীক্ষায় প্রতিটি রাজ্যের শিক্ষা, স্বাস্থ্যব্যবস্থা, পরিকাঠামো, প্রশাসনিক কাজকর্ম প্রভৃতি ক্ষেত্রের শ্রীবৃদ্ধির হিসাব খতিয়ে দেখেন পত্রিকার বিশেষজ্ঞ দল। রাজ্যগুলির বাজেট, কোন খাতে কত টাকা বরাদ্দ, কত সংখ্যক প্রকল্প গ্রহণ, প্রাথমিক শিক্ষার পরিকাঠামো প্রভৃতি একাধিক বিষয়ের ওপর তাঁরা বিচার বিশ্লেষণ চালান। সমস্ত সমীক্ষার -নিরীখে ইন্ডিয়া টুডে তাদের 'স্টেট অফ দ্য স্টেটস্' সমীক্ষায় বড় রাজ্যের হিসাবে পাঞ্জাবকে পয়লা নম্বরে রেখেছে। ছোটো রাজ্যের হিসাবে পন্ডিচেরী প্রথমে। পশ্চি মবঙ্গের স্থান শেষের দিক থেকে দশ নম্বরে। এখানে উল্লেখ্য, পাঞ্জাব রাজ্যের মসনদে রয়েছে আকালি-বিজেপি জোট। মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ সিং বাদল। বড় রাজ্য হিসাবে প্রথমে রয়েছে পাঞ্জাব, দ্বিতীয় পন্ডিচেরী, তৃতীয় গোয়া, চতুর্থে মিজোরাম।

এবার দেখা যাক কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিকাঠামো ও অন্যান্য ক্ষেত্রে রাজ্যগুলির হাল-হকিকত।

কৃষি ঃ ভারতের মতো কৃষি প্রধান দেশের ক্ষেত্রে কৃষির ভূমিকা সর্বদা আগে বিচার করা হয়ে থাকে। ইন্ডিয়া টুডে রাজ্যওয়ারি সমীক্ষায় কৃষিতেও পাঞ্জাব এগিয়ে। আবার হিমাচল প্রদেশের মতো রাজ্য অন্যান্য দিকে এগিয়ে থাকলেও, প্রথম সারিতে তাদের জায়গা না পাওয়ার ক্ষেত্রে মূল প্রতিবন্ধকতা হল জলবায়ু ও ভৌগোলিক অবস্থান, যা কৃষির উন্নতির পক্ষেও সহায়ক নয়। পাঞ্জাবে প্রতি হেক্টর জমিতে প্রায় ৪,০১৭ কেজি শস্য উৎপাদিত হয়। যেখানে মহারাষ্ট্রে প্রতি হেক্টর জমিতে উৎপাদিত শস্যের পরিমাণ মাত্র ৯৪০ কেজি। দিল্লীতে হেক্টর প্রতি শস্যর পরিমাণ ৩, ৪০৫ কেজি। হরিয়ানায় ৩,৩৯৩ কেজি প্রতি হেক্টর। নীচের সারণীতে দেখা যাক কৃষির উন্নতির গতি-প্রকৃতির নিরীখে কোন রাজ্য কোথায় দাঁড়িয়ে —

বড় রাজ্য — (ক্রম অবস্থান অনুযায়ী)

১. পাঞ্জাব, ২. হরিয়ানা, ৩. তামিলনাড়ু, ৪. অন্ধ্রপ্রদেশ, ৫. কর্ণাটক, ৬. গুজরাট, ৭. মহারাষ্ট্র, ৮. উত্তরপ্রদেশ, ৯. কেরল, ১০. উত্তরাখন্ড, ১১. পশ্চি মবঙ্গ, ১২. রাজস্থান, ১৩. মধ্যপ্রদেশ, ১৪. জম্মু ও কাশ্মীর, ১৫. হিমাচল প্রদেশ, ১৬. বিহার, ১৭. ওড়িশা, ১৮. ছত্তিশগড়, ১৯. ঝাড়খন্ড, ২০. অসম।

ছোটো রাজ্য — (ক্রম অনুযায়ী অবস্থান)

১. পন্ডিচেরী, ২. গোয়া ৩. দিল্লী, ৪. নাগাল্যান্ড, ৫. ত্রিপুরা, ৬. মিজোরাম, ৭. মণিপুর, ৮. মেঘালয়, ৯. অরুণাচলপ্রদেশ ১০. সিকিম।

শিক্ষা ঃ অপ্রিয় হলেও সত্য, ভারতের একটা বড় অংশে আজও শিক্ষার আলো পৌঁছায়নি। প্রাথমিক শিক্ষার ছিঁটে ফোটাও মেলে না এমন গ্রামও কম নেই এদেশে। উচ্চ শিক্ষার প্রসারে হিমাচলপ্রদেশ, সিকিম, পন্ডিচেরী যেমন এগিয়ে রয়েছে, তেমনি বিহার, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চি মবঙ্গের মতো শিক্ষায় পিছিয়ে থাকা রাজ্যও রয়েছে। উল্টে বলা যেতে পারে, শিক্ষায় পিছিয়ে থাকা রাজ্যেরই সংখ্যাধিক্য বেশি। এদেশে এখনও এক স্কুল, এক শিক্ষক এমন বিদ্যালয়ও নজরে আসে। এর ওপর একটার পর একটা বেসরকারি স্কুল গড়ে উঠছে। মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থা। সরকারি স্কুলের শিক্ষায় অতটা ভরসা নেই অভিভাবকদেরও। ফলে শিক্ষাও হয়ে দাঁড়িয়েছে পয়সা যার, শিক্ষা তার-এর মতো। সমীক্ষার রিপোর্টে দেখা যায় বড় রাজ্যগুলির মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছে হিমাচল প্রদেশ, কেরল ও উত্তরাখন্ড। পশ্চি মবঙ্গের স্থান একাদশে। বিস্ময়ের হলেও ছোট রাজ্যগুলির মধ্যে দিল্লীর স্থান সবার নীচে।

স্বাস্থ্য ব্যবস্থার নিরীখে রাজ্যগুলির অবস্থান এরকম ঃ

বড় রাজ্য — (ক্রম অনুযায়ী অবস্থান)

১. পাঞ্জাব, ২. কেরল, ৩. হিমাচলপ্রদেশ ৪. মহারাষ্ট্র, ৫. হরিয়ানা, ৬. তামিলনাড়ু, ৭. কর্ণাটক, ৮. গুজরাট, ৯. জম্মু ও কাশ্মীর, ১০. অন্ধ্রপ্রদেশ, ১১. রাজস্থান, ১২. মধ্যপ্রদেশ, ১৩. পশ্চি মবঙ্গ, ১৪. উত্তরপ্রদেশ, ১৫. ওড়িশা, ১৬. উত্তরাখন্ড, ১৭. অসম, ১৮. বিহার, ১৯. ছত্তিশগড়, ২০, ঝাড়খন্ড।

ছোটো রাজ্য — (ক্রম অবস্থান অনুযায়ী)

১. দিল্লী, ২. গোয়া, ৩. মিজোরাম, ৪. সিকিম, ৫. পণ্ডিচেরী, ৬. ত্রিপুরা, ৭. নাগাল্যান্ড, ৮. অরুণাচলপ্রদেশ, ৯. মণিপুর, ১০. মেঘালয়।

আইন-শৃঙ্খলা ঃ একটি রাজ্যের প্রশাসনিক পরিস্থিতির উপরই নির্ভর করে সে রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলার বিষয়টি। প্রশাসনিক তৎপরতা যে কোনও রাজ্যের উন্নতিতে বড় ভূমিকা পালন করে থাকে। রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার বিষয়টি একশভাগ কার্যকর করা কঠিন হলেও, সরকারের সদিচ্ছা থাকলে তা বলবৎ করা যায়। সেক্ষেত্রে রাজ্যের প্রয়োজনীয় পুলিশ, বিচারপতির প্রয়োজন। বেশিরভাগ রাজ্যের হাজার হাজার মামলা ঝুলে রয়েছে। রায় বের হয়নি। হত্যা, অপহরণ, ধর্ষণের মতো অপরাধ দমনের বিষয়টি অন্যান্য অপরাধ নিয়ন্ত্রণের তুলনায় বেশি করে বিচার করা হয়। তাবড় তাবড় আইনবিদ্‌রাও একথা স্বীকার করেন যে, রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত না হলে, রাজ্যে যে কোনও আইন বলবৎ করতে প্রশাসনকে যথেষ্ট বেগ পেতে

(এরপর ১৩ পাতায়)

দোকানের রমরমাই বোঝায় পাঞ্জাবের লোকেদের ক্রয়ক্ষমতা বেশি।

সর্বভারতীয় স্তরে সমীক্ষাতে কোন রাজ্য কোথায়

বড় রাজ্য	ছোটো রাজ্য
১. পাঞ্জাব	১. দিল্লী
২. হিমাচল প্রদেশ	২. পণ্ডি চেরী
৩. তামিলনাড়ু	৩. গোয়া
৪. কেরল	৪. মিজোরাম
৫. গুজরাট	৫. সিকিম
৬. হরিয়ানা	৬. অরুণাচলপ্রদেশ
৭. কর্ণাটক	৭. নাগাল্যাণ্ড
৮. মহারাষ্ট্র	৮. মণিপুর
৯. জম্মু ও কাশ্মীর	৯. ত্রিপুরা
১০. অন্ধ্রপ্রদেশ	১০. মেঘালয়
১১. উত্তরাখন্ড	
১২. রাজস্থান	
১৩. মধ্যপ্রদেশ	
১৪. পশ্চি মবঙ্গ	
১৫. অসম	
১৬. ছত্তিশগড়	
১৭. ওড়িশা	
১৮. উত্তরপ্রদেশ	
১৯. ঝাড়খন্ড	
২০. বিহার	

বিষয় ঃ স্বস্তিকা পূজা স

স্বস্তিকা'র ১৪১৬ পূজা সংখ্যা এবং তন্মধ্যেকার তথাগত রায়ের 'ভাষা-উপভাষা -অপভাষা' — প্রবন্ধটির জন্য অভিনন্দন জানাই। প্রবন্ধটির বিষয় শুধু সময়োপযোগীই নয় — আমাদের জাতীয় তথা সমাজজীবনের সুরক্ষার প্রশ্নে জরুরীও বটে। উক্ত প্রবন্ধের বিষয় গৌরবের কারণে কিছু বলতে চাই। উপভাষা (সুনীতিকুমারের ব্যবহৃত পরিভাষায় নি-ভাষা)'র সমস্যা আর অপভাষা'র সমস্যা এক নয়। এদের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য এবং চরিত্র সবই আলাদা। ভাষা বা উপভাষা (নি-ভাষা)'র মৃত্যু আছে। যেমন যীশুখৃস্টের মাতৃভাষা আরমাইক — আজ আর নেই। তৈরি করা ভাষা — যেমন সংস্কৃত তার বহমানতা জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে এত চেষ্টা সত্ত্বেও এর মৃত্যু নেই। ল্যাটিনের ভাগ্যে যা ঘটেনি। উর্দুকে শুধু দেবনাগরী লিপিতে পাল্টে দিলেই এর মৃত্যু ঘটে যাবে। এসপেরান্তোকে সংস্কৃত'র জন্য করা খরচের অনেক বেশি খরচ সেই ১৮৮৭ থেকে করেও দাঁড় করানো যায়নি। অপভাষা'র ক্ষেত্রটি কিন্তু আলাদা। অপভাষা সমাজের মধ্যেই তৈরি হয়।

২. "অপভাষা" বলতে চলন্তিকাকার বোঝেন — "অসাধু গ্রাম্য বা ইতর ভাষা।" সাহিত্য সংসদের অভিধানে শব্দটির ইংরাজী প্রতিশব্দ হ'ল — "Obscene or slang or vulgar." ইংরেজী ভাষার বিস্তৃত ক্ষেত্র সামনে থাকাতে তথাকার কথা ব'লে বলা যায় slang শব্দগুলি ভাষার ক্ষেত্রে ঋণাত্মক নয় — ধনাত্মক। ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য তা slang নামে পরিচিত। যেমন — photo, photograph-এর slang। অর্থ ও ব্যবহার ভেদে Police-ও slang। আবার অনেক slang ús জাতেও উঠেছে। 'জেতের' শব্দ slang-এ পরিণত হয়েছে। slang-এর অভিধান ও ভাষাতত্ত্ব জ্ঞানচর্চায় একটি সম্পদ বিশেষ। কথা হ'ল obscene বা vulgar-ও কি ধনাত্মক? আমাদের সুতানুটির খেউড় (এখনও উত্তরবঙ্গের মটকাতে যা দেখা যায়) ক্ষেত্রবিশেষে obscene-ও বটে, vulgar-ও বটে। আমাদের অনেকেই বার্তালাপে ওই ধরনের শব্দগুলি ব্যবহার করে থাকি। ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় এসব শব্দের ধনাত্মক দিক অনেক ক্ষেত্রে ধরা পরে। শুনেছি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এবং

অপভাষা অনুপ্রবেশের মতোই একটি যুদ্ধ ঘোষণা— সার্বিক আক্রমণ

তারকেশ্বর পাল

স্নেহাংশু আচার্য মশাই ওই ধরনের শব্দাবলী ব্যক্তিগত বার্তালাপে ব্যবহার করতেন। এই ধরনের ব্যক্তিত্বের কথা উল্লেখ করলাম — কারণ ওই ধরনের শব্দ ব্যবহারে ঐসব ব্যক্তিত্বের কোনও ঋণাত্মক প্রতিক্রিয়া নেই। সৈয়দ মুজতবা আলী "অল্প বিস্তরে" বলছেন, ঐ ধরনের "অপভাষা" উচ্চ ক্ষমতাশালী অধিকারীরাই ব্যবহার করতে পারেন। তিনি রাজশেখর বসু সম্বন্ধে কথাগুলি বলেছিলেন। তবে রবীন্দ্রনাথে কিন্তু ঐ ধরনের প্রয়োগ নেই — বঙ্কিম-শরতে আছে - আমি যতটা জানি।

৩. আসলে লেখক শ্রীরায় যে সমস্যার কথা বলতে চেয়েছেন — সেটি মনে হয় ভাষার ক্ষেত্রে অনাচার বা ব্যভিচার। "অনাচার"-এর চালন্তিক অর্থ হল ঃ অবিহিত সমাজবিরুদ্ধ অভদ্র বা গর্হিত আচার। আর "ব্যভিচার" হল ঃ অন্যথাচরণ, স্খলন। অলঙ্কার শাস্ত্রে "ব্যভিচারী" হল ঃ রস সৃষ্টিতে স্থায়ীভাবের পরিপুষ্টকারী গৌণভাবটি। প্রসঙ্গতঃ Poetic justice পরিভাষাটি মনে রাখলে শ্রীরায়ের "অপভাষা" নিয়ে দুশ্চিন্তা আমরা বুঝতে পারবো। শিল্পের শরীর, প্রকাশভঙ্গি এবং প্রতীক — এগুলি উদ্দীষ্ট রস সৃষ্টিতে সাযুজ্য না আনলেই Poetic justice-এর নিয়ম ভঙ্গ হলো। যাই হোক "অনাচার" কিংবা "ব্যভিচার" উভয়ক্ষেত্রই কিন্তু অপরাধ। লেখক শ্রীরায় আমাদের দেশে ভাষার উপর যে কান্ডটি ঘটে চলেছে তাকেই মনে ক'রে 'অপভাষা'র বিষয়টির অবতারণা করেছেন। চলচ্চিত্র, নাটক যাত্রা ইত্যাদি শিল্প ক্ষেত্রগুলির কথা বলতে গিয়ে গুণীজনেরা বলছেন — নাটকে অভিনয়ের সুর চলচ্চিত্র থেকে চড়া পর্দায় হবে — যাত্রায় তার থেকে চড়া। ঐ চড়া সুর সংলাপ, সংলাপের শব্দ চয়নে বা ভাষাতেও রক্ষিত হবে। এই জন্যই প্রতিটি ক্ষেত্রের ভাষা আলাদা। একটার আরেকটিতে প্রয়োগ Poetic justice - এ যেমন বাধে তেমনি অনাচার বা ব্যভিচারও হয়ে দাঁড়ায়। রাজনৈতিক স্লোগানের যে সুর ভাষা, আমরা এতদিন দেখেছি শুনেছি (সি পি এমের সাম্প্রতিক অতীতকালীয় স্লোগানের অনাচারী বা ব্যভিচারী সুর যা বন্দেমাতরম্ ধবনিতেও

পরিলক্ষিত) তা থেকে অতি-সাম্প্রতিক যাত্রার চড়া সুরের কথাবন্ধ, "মা-মাটি-মানুষ" সেই Poetic justice বিরোধী এবং অনাচারী ব্যভিচারী।

৪. ভাষা এবং সংস্কৃতিসমাজের সবচেয়ে শক্তিশালী অঙ্গ। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকে 'ভাষা'র প্রয়োগশৈলীর দিক নিয়ে আধুনিক পৃথিবীতে বিস্তর গবেষণা হয়েছে। (যদিও আমার সামান্য জ্ঞানের পরিধিতে ঐ সকল গবেষণা পাণিনী বা মুগ্ধবোধ-এর উচ্চতায় এখনো পৌঁছতে পারেনি। এ বিষয়ে ঋষি অরবিন্দের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা অবশ্য স্মর্তব্য)। যাই হোক ওই সকল গবেষণার ফলশ্রুতিতে ১৯৩৬ সালে মহাশক্তিধর স্ট্যালিন সাহেব বুঝলেন যে — মানুষগুলির ভাষা পাল্টে দিতে পারলেই অভিপ্রেত জো-হুজুর ক্যাডার তৈরি করা যাবে। তাই প্রলেতারিয়ান ভাষার (প্রকৌশলীয় বা ইঞ্জিনিয়ারিং পরিবর্তন ঘটিয়ে) জন্য ফতোয়া জারী করেন। যাই হোক্ ক্ষমতাশালী গোষ্ঠীর ধমকে তা শেষ পর্যন্ত পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু এই যে ভাষাকে সচেতন ভাবে পাল্টে দেওয়ার ভাবনা (যেটা উর্দুর মধ্যে পরিলক্ষিত) — সেটা সাম্রাজ্যবাদীদের — ভারত বিরোধী শক্তির কাছে বেশ ভালোভাবেই সমাদৃত। ১৮৩৫ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি, বৃটিশ সংসদে তরুণ সাংসদ শ্রীমান ব্যারিংটন মেকলে বলছেন, ভারতের শক্তি হলো তার সংস্কৃতি। তাকে তাঁবে রাখতে চাইলে তার সংস্কৃতিকে এমনভাবে ধবংস করতে হবে যাতে ওখানকার মানুষেরা আমরা যা চাই সেই ভাবে কথা বলবে। লক্ষ্য করুন এরপরই ভারতের বড় বড় পরিবার গুলির ছেলেদের স্কুল থেকে শুরু করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যারিস্টারী বা আই-সি-এস পর্যন্ত পড়াশুনা বিলেতে করা হচ্ছিল। ঋষি অরবিন্দের ক্ষেত্রে রাম উল্ট। বুঝিলেও নেহেরুর ক্ষেত্রে বা মিঃ গান্ধীর এবং আরও অনেকের ক্ষেত্রে ঠিকঠাকই ঘটিল। ইহাদের কাজে কর্মে লেখায় সবকিছু আছে কিন্তু দেখবেন ভারত সম্পর্কে গৌরব বোধ — ভারতমাতার ঐক্যবদ্ধ রূপ অনুপস্থিত। অবশ্য আমাদের দুর্ভাগ্য, এর আগেও ঐ ধরনের চিন্তা ক্ষেত্র দেখেছি। রাজা রামমোহন রায় আর্মেনিয়ার স্বাধীনতার জন্য আন্দোলনকারীদের অভিনন্দন বার্তা পাঠান। স্পেনের আন্দোলনকারীদের জয়ে নিজের বাসগৃহ আলো দিয়ে সাজান কিন্তু স্বাধীনতার সেই পূজারী নিজে বিদেশী শাসকের জন্য আরেক বিদেশী শাসকের কাছে ওকালতি করতে যায়। স্বদেশ ভাবনা নেই। যেটা ১৭৫৭-এর পলাশীর আমবাগানে জড়ো হওয়া এদেশীয় মানুষের মধ্যে দেখেছি। বিদ্যাসাগর মশাই আয়কর কমাবার জন্য বিদেশী আয়কর আধিকারিককে নেমন্তন্ন ক'রে খাওয়ান। (শিবাজী মহারাজ ছাড়া গত ২৩০০ বছরে বিষ্ণুগুপ্ত — চাণক্যের পথ, বিবেকানন্দ যাদের সাক্ষাৎ দেবতা বলেছেন, সেই স্বদেশবাসীর কাছে যাওয়ার কথা ১৯২৫-এ ডাক্তারজী ছাড়া কেউ বললেন না।) স্ট্যালিনের প্রসঙ্গ থেকে প্রাতঃস্মরণীয় ডাক্তারজী (ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার) পর্যন্ত এই কথাগুলি বলার উদ্দেশ্য আমাদের চোখের সামনে আমাদের সংস্কৃতি তথা ভাষাকে সচেতনভাবে নষ্ট করে দেওয়ার দুরভিসন্ধিমূলক ষড়যন্ত্র ও তা কার্যকর করা হচ্ছে — আমরা নির্বিকার।

৫. আমাদের সংস্কৃতির আধুনিক কেন্দ্রবিন্দু হলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্র চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু হলো উপনিষদ। অথচ আমাদের তথাকথিত সচেতন সংবাদমাধ্যমগুলি রবীন্দ্রসঙ্গীত বা রবীন্দ্রচর্চার ক্ষেত্রে যাদের প্রচার করে বেড়াচ্ছে তাদের অধিকাংশই হলো বামপন্থী (অর্থাৎ মিথ্যাচারী এবং আত্মপ্রবঞ্চ নাকারী তথা হিপোক্র্যাট) আর এই বামপন্থীরা কেউই উপনিষদ মান্য করা তো দূরের কথা অচ্ছুতই মনে করেন। ফল সাংঘাতিক হলো
রবীন্দ্রসঙ্গীতের, রবীন্দ্রভাবনার মূল থেকে আমাদের সরিয়ে রাখা হচ্ছে। বামপন্থী রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইয়েদের গায়কী শুধু মেকি ও অনান্তরিকই নয়, সেই গায়কীর জন্য আমরা রবীন্দ্রনাথ থেকে দিনে দিনে দূরে সরে যাচ্ছি — ওরা সফল হচ্ছে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে বর্তমানে যেসব উগ্র যৌনতাযুক্ত অঙ্গভঙ্গির সঞ্চ ালন প্রদর্শন করে ব্যবসা চলছে — তার জন্য কোনও প্রতিবাদ নেই। বামপন্থীদের আখড়া "ডি - ডি-বাংলা" থেকে রবীন্দ্রজীবনীকে যেরকম অশ্লীলভাবে পরিবেশন করা হচ্ছে তার বিরুদ্ধে কোনও সংবাদ মাধ্যম বা তাদের আঁতেল মহাপুরুষদের কণ্ঠ শোনা যায় না। (প্রসঙ্গত বলি, বইমেলা উপলক্ষে একটি বাজারী পত্রিকার প্রকাশিত শত বছরে বাংলা কবিতার চয়নে জীবনানন্দ বাদ)। এই সঙ্গে একটু খেয়াল করলেই দেখা যাবে সারা ভারতে সব ভাষায় চলচ্চিত্র, নাটক, দূরদর্শনের বিজ্ঞাপন, সিরিয়ালগুলিতে — উগ্র যৌনতা, নারীদেহের উলঙ্গপনা, বিবাহ ও পারিবারিক বন্ধনবিরোধী চিত্রনাট্য, খুন-ষড়যন্ত্র-অর্থলিপ্সা কেন্দ্রিক মারপিটের ধরন-ধারণ সর্বত্র একই রকম। শ্রী রায় যে চলচ্চিত্র পরিচালক প্রবরের সঙ্গে দূরদর্শনের আলোচনার কথা উল্লেখ করেছেন — তাঁর মতোই ঐ সব মহান সৃষ্টিগুলির পরিচালক ও নিয়ামকবৃন্দ সমান মানের শিক্ষিত ও মানসিক লক্ষণাক্রান্ত। যাই হোক্ সারা ভারতে একই সুত্রানুযায়ী এই অপসংস্কৃতির সচেতন আক্রমণ চলছে — এ ব্যাপারে আমরা নির্বিকার।

৬. বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে যা চলছে তা হিন্দীর ক্ষেত্রে বা ভারতের অন্যান্য ভাষার ক্ষেত্রেও সমানভাবে চলছে। লেখক শ্রী রায় যে 'তামিল' ভাষীদের প্রশংসা ক'রেছেন — তাদের ক্ষেত্রেও। সান টি ভি চ্যানেল নিয়ম ক'রে দেখবেন তবেই বুঝবেন।

৭. বাংলার ক্ষেত্রে কী ঘটছে। বাংলা দৈনিকের নামে ইংরাজী ভাষা শুধু নয় লিপি পর্যন্ত ব্যবহার করা হচ্ছে। টিভি চ্যানেলগুলির নাম রোমান অক্ষর সমৃদ্ধ বাংরিজিতে। দূরদর্শনের বাংলা ভাষার

(এরপর ১০ পাতায়)

ছড়া-কাহিনী অভিনব

নারায়ণ চন্দ্র ।। স্বস্তিকা পূজা সংখ্যা ১৪১৬ পড়লাম। এমন বিষয় বৈচিত্র্যে ও ভারসাম্যে পরিপূর্ণ একটি পূজা সংখ্যা দ্বিতীয় আর একটি আছে কি না আমার জানা নেই। যেমন উপন্যাস নির্বাচনে বৈচিত্র্য, তেমনই গল্প নির্বাচনে সমাজ সচেতনতা সুখ পাঠ্যের দাবী করতেই পারে। যে সমস্ত প্রবন্ধ এই সংখ্যায় সংকলিত হয়েছে, সেগুলি পশ্চি মবাংলার বাণিজ্য সফল যে কোনও শারদীয়া সংখ্যার চেয়ে নিঃসন্দেহে উচ্চ কোটির। সঙ্গে রয়েছে রম্য রচনা, ছড়া কাহিনী, স্মৃতি কথা ও ভ্রমণ কথা। ছড়া কাহিনীটি অভিনবত্বের দাবী রাখে। ছড়ার মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশের মুসলিম সমাজের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং এদেশের তথা এই রাজ্যের কাণ্ড -জ্ঞানহীন সীমানা-রাজনীতির চাচা কাহিনী ছড়ার মাধ্যমে এমন সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা যায় একথা আগে জানা ছিল না। শিবাশিস দণ্ড কে অসংখ্য

এবারের পুজো সংখ্যা অনেকবারের তুলনায় উৎকৃষ্ট

তারক সাহা

আমি বেশ কয়েক বছর যাবৎ স্বস্তিকার পুজো সংখ্যা নিয়মিত পড়ে আসছি। তবে এটা অবশ্যই মুক্ত কণ্ঠে বলতে দ্বিধা নেই যে, এবারের পুজো সংখ্যা বলা যায় অন্য অনেক বাজারী পুজো সংখ্যার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে অনায়াসে। কী রচনা সংগ্রহে, কী অঙ্গবিন্যাসে, এবারের পুজো সংখ্যা অনবদ্য।

আসলে স্বস্তিকার উৎকর্ষতার উত্তরণ শুরু পত্রিকার রঙীন যুগের গোড়াপত্তন থেকে। এবারের পুজো সংখ্যায় পুরোটা পড়ে ওঠা যায়নি এই নিবন্ধ লেখার আগে। অনেক আগে থেকে শুনেছি সুমিত্রা ঘোষের সামাজিক উপন্যাস 'সুরবালার সংসার' লেখাটা অনবদ্য এবং শোনার পর থেকে উপন্যাসটি পড়ার প্রলোভন আমি সামলাতে পারিনি। পত্রিকাটি হাতে পেয়েই এক ঝটকায় উপন্যাসটি পড়ে ফেলেছি। আজকের যুগে বর্তমান প্রজন্মের কাছে একটা সংসারের কী কী চাওয়া-পাওয়া থাকতে পারে তারই একটা দলিল। সুমিত্রাদেবী পুরনো দিনের সঙ্গে নয়া জমানার মেয়েদের মধ্যে তফাৎ কতটা তার একটা সুন্দর চিত্র এঁকেছেন। একধারে দীপার, মায়ের কু-পরামর্শে একটা সাজানো সংসার ভেঙে খান খান করে বাপের বাড়ি চলে আসা এবং আবার সেই মেয়েটিই বাবার পরামর্শে তাঁর গ্রন্থাগারে অযত্নে থাকা একটা উপন্যাস পড়ে নিজেকে কীভাবে সংশোধন করতে চায়, কীভাবে মায়ের বিরুদ্ধে নিজের বিবেকের দংশনে বিদ্রোহিণী হয়ে ওঠে তারই একটা নিদর্শন। মানুষ অপরাধী হয়ে জন্মায় না; সময়, পরিবেশ মানুষকে অপরাধী করে তোলে — তারই এক ভিন্ন স্বাদের পরিচয় রেখেছেন সুমিত্রাদেবী। একদিকে সুরবালা যখন মাত্র ন'বছরের বালিকা, সে যেমন বিয়ে, সংসার কি তার লেশমাত্র ধারণা নেই, তাকেই তার মা শেখাচ্ছেন কীভাবে শাশুড়ি, তথা গুরুজনদের শ্রদ্ধা করতে হবে, কীভাবে সংসার ধর্ম পালন করতে হবে তারই সহজপাঠ যেন নিয়ে নেয় সুরবালা বাপের বাড়ি থেকে। আগের দিনের মেয়েদের হয়ত অক্ষরজ্ঞান ছিল না; কিন্তু মানবতা, মানবধর্মের যেন এক এক পীঠস্থান ছিল ওই সব পরিবারগুলি। অন্যদিকে আধুনিক সমাজে দীপার মা ভাস্করের মতো এক অর্থবান চাকুরে জামাইকে মেয়ে কীভাবে তার আঁচলে বেঁধে এক সুন্দর সংসারকে ভেঙ্গে টুকরো করবে তারই পরামর্শ দেয়। সংসার টেঁকে না। এই তফাৎ খুব দক্ষতার সঙ্গে এঁকেছেন সুমিত্রা দেবী। একদিকে চিরায়ত মূল্যবোধ, আর অন্যদিকে আধুনিকতার নামে স্বেচ্ছাচার। এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে জয়ী চিরায়ত মূল্যবোধই।

সৌমিত্রশঙ্কর লিখিয়ে। ওঁর লেখা বেশ কয়েকবার বড় পত্র-পত্রিকায় পড়েছি। স্বস্তিকায় বেশ কয়েকবছর তিনি তাঁর লেখনীর মাধ্যমে পাঠক সমাজে স্বকীয়তার ছাপ রেখেছেন। 'এ পরবাসে' লেখাটা তাঁর ভিন্নতার স্বাক্ষর রেখেছে। 'এ পরবাসে' উপন্যাসের মতো বহু রণদেব আমাদের সমাজে রয়েছে। শুরুতে যারা লড়ে যায় সংসারের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে — ভাই, বোন, বাবা, মা-র জন্য নিজেকে উজাড় করে দিলেও পরে সে-ই ব্রাত্য হয়ে যায় তাদের সকলের কাছে। একদিকে অপসৃয়মান মূল্যবোধের সমাজে যে যার স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত। অন্যত্র আবার কেউ চায় এই মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠা দিতে। রণদেবের দুই ভাই বিশ্বদেব ও সত্যদেব — এদের মধ্যে বিশ্বদেব চাইছে পৈতৃক বাড়ি বেচে পয়সা আত্মসাৎ করতে, আবার মাতাল সত্যদেব ব্যক্তিগত জীবনে বাড়ি ভাড়াই তার আয়ের উৎস তাই সে চাইছে না বাড়ি বেঁচে সোনার ডিম দেওয়া হাঁসটাকে একেবারে মেরে না ফেলতে। আবার অন্যত্র রণদেবের প্রাক্তন প্রেমিকা নীলা সামন্ত একজন এম এল এ — যিনি রণদেবকে বিয়ে করতে চেয়েও প্রত্যাখ্যাত, সেই নীলা অলক্ষ্যে রণদেবের নার্সিং হোমের খরচা মকুব করে দেয়। যাদের রণদেব আর্থিক সাহায্য করেছে ভিলাইয়ে চাকরি করে,

ছোট ভাইকে ব্যবসায় টাকা যুগিয়েছে, সেই ভাইয়েরা কীভাবে বড় ভাইকে পৈত্রিক সম্পত্তির ভাগ দিতে অস্বীকার করছে — বেইমানির এক জ্বলন্ত উদাহরণ। অন্যত্র মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা দিতে জামাতা জ্যোতির্ময় কৌশলে অসুস্থ শাশুড়িকে দিয়ে কীভাবে রণদেব তার প্রাপ্য সম্পত্তির অংশীদারি থেকে বঞ্চিত না হতে পারে তারই ব্যবস্থা করেছে।

রমানাথ রায় প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক। তাঁর রচনা শৈলী অনবদ্য। ছোট ছোট বাক্যে তাঁর রচনা। দাঁড়ি ছাড়া অন্য কোনও যতি চিহ্ন উনি তাঁর রচনায় ব্যবহার বিশেষ একটা করেন না। গত কয়েকবছরে স্বস্তিকায় যে ক'টা রচনা পড়েছি সেগুলো বিশেষ একটা দাগ ফেলতে পারেনি। এবারের লেখা একটু অন্যরকমের। গল্পের দুটি কেন্দ্রীয় চরিত্র নিখিল আর ভারতী — দু'জন, দু'জনকে ভালোবাসে। নিখিল চাকরি নিয়ে আমেরিকা চলে যাবার আগে ভারতীকে প্রস্তাব দেয় বিয়ে করে সেদেশে নিয়ে যাবার। ভারতী এদেশে চাকরি করে আর একমাত্র সন্তান হিসেবে অসুস্থ বিধবা মার শুশ্রূষা করে। সে যেতে চাইল না। অগত্যা নিখিলকে যেতে হয়। আমেরিকায় বিভিন্ন প্রলোভন সত্ত্বেও অন্য কাউকে বিয়ে করে না। শেষমেশ নিখিল যখন দেশে ফিরল ভারতী তখন দুরারোগ্য ব্যাধি ক্যানসারে আক্রান্ত। রোগে শয্যাশায়ী বুড়িয়ে যাওয়া ভারতীকে দেখে নিজের ইমোশনকে নিখিল সংবরণ করতে পারে না। যৌবনে মানুষ যেমন কেরিয়ারের লোভে জাহান্নামে যেতে পারে, পরিণত বয়সে মানুষ তার ভুল যখন বুঝতে পারে, তার খেসারৎ অনেক বেশি চড়া দামে মেটাতে হয়। 'শেষ নয়, শুরু' ছোট গল্পটি মানুষের জীবনের এমন একটা দর্পন।

এবারের প্রবন্ধগুলির মধ্যে ডঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারীর 'সুখের সন্ধানে মানুষ', কিংবা ডঃ দীনেশ চন্দ্র সিংহের 'অসাধারণ সাধারণ ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে' প্রবন্ধ দুটি বেশ তথ্য সমৃদ্ধ এবং দীনেশবাবুর রচনাটি মর্মস্পর্শী।

সবশেষে বলতে হয় যে, কিশোরদের নিয়ে কোনও রচনার স্থান নেই স্বস্তিকায়। একটা ছড়া নির্ভর গল্প শিবাশিস দত্তের 'গফুর মিঞার স্বপ্ন পূরণ' বেশ সুখপাঠ্য। এই প্রয়াসের জন্য স্বস্তিকার সম্পাদককে ধন্যবাদ। কিশোরদের জন্য রচনা — যেমন ছড়া বা কোনও গল্প স্বস্তিকায় প্রকাশিত হলে স্বস্তিকার রচনাশৈলী আরও সমৃদ্ধ হোত। আসলে ছোট বা কিশোরদের জন্য লেখার গুনাগুণ বিচার কিন্তু বড়রাই করে। ছোটরা কেবল তার রসাস্বাদন করে। বড়রা স্বীকৃতি না দিলে উপেন্দ্র কিশোর, সুকুমার রায়, শিব্রাম চক্রবর্তীরা বাংলা সাহিত্যে শিশু-সাহিত্যিক হিসেবে স্বীকৃতি পেতেন না।

আশা করব, আগামী বারের পুজো সংখ্যায় এমন কিছু সাহিত্য স্বস্তিকার পাঠকদের উপহার দিতে পারবে। আসলে একটা পরিবার বৃদ্ধ থেকে শিশু নিয়ে গঠিত। বড়রা 'স্বস্তিকার' রচনায় গল্প পাবে, আর শিশুরা ব্রাত্য — এমনটা মেনে নেওয়া যায় কি?

অভিনবত্বের দাবী রাখে

ধন্যবাদ।

চণ্ডী লাহিড়ীর রম্য রচনা "ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ" রমণীয় ভিক্ষা নিয়ে তার দর্শন যুগোপযোগী। বিষয়টি গম্ভীর হলেও তার সুললিত লেখনীর গুণে লেখাটি গুরু গম্ভীর হয়ে ওঠেনি।

আমি স্বস্তিকার একজন নতুন পাঠক। অনেক কিছু জানা-অজানার মাঝে আমার দোলাচল। এবারই প্রথম স্বস্তিকার পূজা সংখ্যা আমার হাতে এসেছে। তাই খুবই আগ্রহের সঙ্গে এটি পড়েছি। শ্রী তথাগত রায়কে আমি একজন রাজনীতিবিদ বলেই জানতাম। কিন্তু তিনি যে এমন ভাষাবিদ তা-তো জানা ছিল না। ওনার "ভাষা-উপভাষা-অপভাষা" পড়ার পর আমি ভাষা প্রয়োগ সম্পর্কে অনেক সচেতন হয়ে পড়েছি। পরিশেষে বলে, আমার ধারণা ছিল স্বস্তিকা একটি হিন্দু সাম্প্রদায়িক পত্রিকা। বিষয় নির্বাচনেই তার ছবি নিশ্চিত ফুটে উঠবে। কিন্তু তা না থাকায় হতবাক হয়েছি। ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

নকল ডান তর্জনী

অরূপ শর্মা ।। সত্যজিত রায়ের কৈলাশ চৌধুরীর পাথর গল্পখানা মনে আছে? দুই ভাই। হুবহু একইরকম দেখতে। কৈলাশ ও কেদার। একজন ভাল, আরেকজন মন্দ। ভালকে বন্দী করে, মন্দজন ভাল সেজে বসে

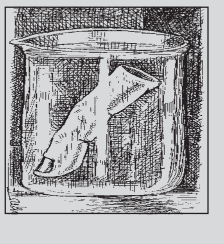

রয়েছে। তো এই ভাল-মন্দের দ্বন্দ্ব কাটিয়ে রহস্যের জট ছাড়ালেন ফেলুদা ওরফে প্রদোষ চন্দ্র মিত্র। ফেলুদার গুরু হতে পারেন শার্লক হোমস। তবে আজকালকার যে কোনও বাঙালী গোয়েন্দার গুরু নিঃসন্দেহে ফেলুদা। দীপঙ্কর দাসের নেপাল রায়ও তার ব্যতিক্রম নন। তাঁর সহযোগী 'তোপসে' রথীন্দ্রনাথ রায়। বিহার পুলিশের আই জি জয়রাম শর্মা ও তাঁর ডামি ভয়ঙ্কর ক্রিমিনাল জিয়াউদ্দিন- কে খুঁজে বার করার কাজে আগাগোড়া ব্যাপৃত থেকেছে এবারের স্বস্তিকা পুজো সংখ্যায় প্রকাশিত দীপঙ্কর দাসের উপন্যাস 'নকল ডান তর্জনী'। আই জি-র সঙ্গে গোয়েন্দা নেপালের আলাপ-চারিতার মুহূর্তে হাতে মাটি লেগে থাকার কারণে করমর্দন এড়িয়ে যাওয়ায় গোয়েন্দার মনে যে সন্দেহের উদ্রেক হয় এবং তাতে ডি জি রূপী জিয়াউদ্দিন ধরা পড়ে ও সর্বোপরি প্রকৃত ডি জি জয়রাম শর্মা মুক্ত হন — তা যেমন গোয়েন্দা গল্প শিল্পসুষমায় অনবদ্য তেমন সামাজিক প্রেক্ষাপটে অনন্য সাধারণ। তবে কিশোর পাঠকের হৃদয়ে গোয়েন্দা নেপাল রায়কে স্থান করে নিতে হলে থিম বৈচিত্র্যের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য।

জাতীয় তথ্যভাণ্ডার

সাম্প্রতিক সংবাদে প্রকাশ, কেন্দ্রীয় সরকার ভারতে ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন নামে এক 'জাতীয় তথ্য ভণ্ডার' গড়ে তুলতে চাইছে। এতে নাকি ভারতীয়দের একটি পরিচয় নম্বর থাকবে। এর কর্ণধার হচ্ছেন ইনফোসিস-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা নন্দন নিলেকানি। তাঁর যোগ্যতা সন্দেহাতীত। কিন্তু তিনিও তো মানুষ। তাঁর নিশ্চয় অতিমানবিক বা দৈবী ক্ষমতা নেই। ভারতে বসবাসকারী সমস্ত মানুষের আইডেন্টিটি কার্ড করে দিলে তো কয়েক লক্ষ (নাকি কোটি?) পাকিস্তানী এবং বাংলাদেশী অবৈধ বসবাসকারী মানুষেরও ভারতীয় হিসাবে বৈধতা এসে যাবে। আমরা সবাই জানি, পাকিস্তান এবং পাকিস্তানের দখল করা কাশ্মীর থেকে চোরাগোপ্তা লস্কর-ই-তৈবা, তালিবান, মুজাহিদিন নামে প্রচুর ভারত বিরোধী মুসলিম অনুপ্রবেশ ঘটছে। আর ভারতের পূর্বপ্রান্তে পশ্চিমবঙ্গের ন'টি সীমান্তবর্তী জেলায় এবং অসমে লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশী মুসলমান অবৈধ অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে ওইসব অঞ্চলের জনবিন্যাসের চিত্র-চরিত্রকেই পাল্টে দিয়েছে। আর কে না জানে, মুসলিমরা যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করবে, সেখানে সংখ্যালঘু হিন্দুদের জান-মান-মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকা অসাধ্য।

এই অনুপ্রবেশ নামক ধর্মীয় অভিযানটি 'যুদ্ধ' নয়, অথচ তা যুদ্ধ জয়ের চেয়ে অনেক বেশি কার্যকরী। এই পন্থা অবলম্বন করেই আজ পশ্চিমবঙ্গে তারা শতকরা ২৫ থেকে ৩০-এ উঠে এসেছে। তাছাড়া সন্ত্রাস এবং উৎপাদনের ফারাক তো আছেই। আমাদের হিন্দুদের বিশেষত বাঙালীবাবুদের বাড়িতে যখন 'আমরা দুই, আমাদের এক' নীতি চলছে তখন ওদের এক একটি সংসারে ৬/৭টি সন্তান কোনও ব্যাপারই নয়। এই যে সংখ্যাতীত অনুপ্রবেশ এবং প্রজনন — এদের যদি একবার ঝাড়াই বাছাই না করেই 'পরিচয় নম্বর' দিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে তার মতো ভুল আর কিছু হবে না। কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার এই বিষয়ে কোনও উচ্চবাচ্য করবে না, আমরা জানি। আর হালফিলের তৃণমূল কংগ্রেস মহাকরণ দখলের তাগিদে আর এক ধাপ বেশি সংখ্যালঘু তোষণ কার্ড খেলে যাবে। এইসব রাজনৈতিক দলের কাছে দেশ নয়, দেশাত্মবোধ নয়, রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলটাই হলো আসল কথা।

এরপর ১০/১৫ কিম্বা বড় জোর ২০ বছর পরে যখন পূর্ব ভারতে প্লেবিসাইট অথবা লেবেনস্রম-এর লেলিহান শিখা ১৯৪৬-এর ১৬ আগস্টের পুনরাভিনয় ঘটাবে তখন কিন্তু অনিবার্যভাবে পশ্চিমবঙ্গ অসমের হিন্দুদের উদ্বাস্তু (বাঙালীদের ক্ষেত্রে দ্বিতীয়বার) হতে হবে। তাই দেশ পরিচালকদের প্রতি এই পত্রলেখকের কিছু পরামর্শ —

(১) ১৯৫১-র জনগণনার রিপোর্ট দেখে এবং ১৯৫৬ ও ১৯৫৭-র মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলার ল্যান্ড রিফর্মস অফিসের দলিল-দস্তাবেজ ঘেঁটে সেই সময়কার ভারতীয় প্রজার হিসাব করা হোক।

(২) ১৯৬১ / ১৯৭১ / ১৯৭৫-৭৬-র যথাক্রমে জনগণনার রিপোর্ট এবং বাংলাদেশী অনুপ্রবেশের হিসাব নেওয়া হোক। এক্ষেত্রে সীমান্তবর্তী জেলায় বসবাসকারীদের জমির (বাস্তু এবং কৃষিজমি) রেকর্ড অবশ্যই দেখতে হবে।

(৩) সাবেক পূর্ব পাকিস্তান এবং বাংলাদেশে পাশ করে আসা স্কুল / কলেজের সার্টিফিকেটের সত্যতা যাচাই করতে হবে।

(৪) ভারতের (বেশিরভাগ পশ্চিমবঙ্গের) মেয়েকে বিয়ে করে এদেশেই ঘর-জামাই হয়ে পাকাপোক্ত নাগরিক বনে যাওয়া যাচাই করে দেখতে হবে।

(৫) বৈধ পাসপোর্ট-ভিসা নিয়ে ভারতে ঢুকে আর স্বদেশে ফিরে না যাওয়া লোকেদের খুঁজে বের করতে হবে।

(৬) কিন্তু বাংলাদেশ থেকে যেসব হিন্দু এদেশে এসেছেন তাঁদেরকে শরণার্থী রূপেই গণ্য করতে হবে। তাঁরা সেদেশে অত্যাচারিত হয়ে মান-ইজ্জৎ নিয়ে বেঁচে থাকার জন্যই পশ্চিমবঙ্গে তথা ভারতে চলে আসতে বাধ্য হচ্ছেন।

এইসব কাজ করার পরে ভারত সরকার যেন ইউনিক পরিচয়-পত্র ভারতীয় নাগরিকদের হাতে তুলে দেয়।

জগন্নাথ মুখোপাধ্যায়, ৫২/এ রাজা রামমোহন রায় রোড, কলকাতা-৮

শ্যামাপ্রসাদ

দিল্লীর শ্যামাপ্রসাদ রিসার্চ ফাউন্ডেশনের ডিরেক্টর তরুণ বিজয় 'প্রণবদার বঙ্গবিভাগ' শীর্ষক নিবন্ধে (স্বস্তিকা - ১৪।৯।০৯) বলেছেন — "কংগ্রেসী টিকিটে বাংলার বিধায়ক হয়েও" ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী মুসলিম লীগের ডাকা 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন'-এ ১৯৪৬-এর আগস্ট কলকাতার বুকে সংগঠিত নারকীয় ঘটনাবলীর তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। কথাটি পুরোপুরি ঠিক নয়। ১৯৪৬ সালে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কংগ্রেসী বা কংগ্রেসী বিধায়ক ছিলেন না। বস্তুত, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মাত্র একবারই কংগ্রেসী সদস্য রূপে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসাবে ১৯২৯ সালে বেঙ্গল লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলে নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু, পরবর্তীকালে কংগ্রেস লেজিস্লেটিভ কাউন্সিল বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিলে তিনি কাউন্সিল থেকে পদত্যাগ করেন, এবং পর বৎসর, অর্থাৎ ১৯৩০ সালে 'Independent' সদস্য রূপে পুনরায় নির্বাচিত হন। রাজনীতিতে কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের সেখানেই ইতি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৩৯ সলে হিন্দু মহাসভার যোগদানের পর শ্যামাপ্রসাদ ১৯৪০-৪৪-এর জন্য অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার কার্যকরী সভাপতি এবং বাংলার হিন্দু মহাসভার সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৪৯ সালে তিনি মহাসভার কার্যকরী সভা থেকে পদত্যাগ করেন এবং ১৯৫১ সালে সর্বভারতীয় সংগঠন 'ভারতীয় জনসঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠা করেন — (সূত্র : A phase in the life of Dr. Shyamaprasad Mokerjee. ১৯৩৭-১৯৪৬' Dr. Anil Chandra Banerjee)।

বিমলেন্দু ঘোষ, কলকাতা-৬০

দুর্গাপূজা ও সরকার

বর্তমানে দুর্গাপূজার জন্যে বিভিন্ন ক্লাব সংগঠন বিপুল অর্থ ব্যয় করে। পূজার প্রায় এক মাস বাকী থাকলেও পূজা মণ্ডপে সাজ-সজ্জার জন্য কাজ শুরু করে। কিন্তু পূজার জন্য সরকার মাত্র চার দিনের মধ্যে ভাসান / বিসর্জন দিতে চাপ দেয়। বড় বড় পূজার ক্ষেত্রে দুই দিন বৃদ্ধি করে। ফলে অনেকের পক্ষে ভালোভাবে পূজার ঠাকুর, প্যান্ডেল দেখার ও আনন্দ উপভোগ করার সুযোগ থাকে না। আগে পূজার ভিড় সামলানোর জন্যে দশমী, একাদশী, দ্বাদশীর দিনকে ঠাকুর দেখার দিন বলে লোকে বেরিয়ে পড়ত ও আনন্দে সামিল হোত। পূজার উদ্যোক্তারা উক্ত দিনগুলিতে সিনেমা, নাটক, যাত্রা, গান-বাজনার ব্যবস্থা করত।

বর্তমানে পূজা করা কঠিন হিন্দুদের নিকট। পূজার জন্যে আবার পারমিশন— কর্পোরেশনের / মিউনিসিপ্যালিটির পারমিশন নিতে হয় এবং সে বাবদ লাইসেন্স ফি, থানায় নজরানা দিতে হয়। দমকল বিভাগে অর্থ, সি এস সি বা রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের পারমিশন-ফি বাবদ অর্থ দিতে হয়। অথচ পূজা মাত্র চার দিনের ভাবলেও চমকে যেতে হয়। বিপুল অর্থ ব্যয় নিষ্ফল হয়।

মুসলিম সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে কোনও ব্যয় ও ঝামেলা নেই কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠান করার ক্ষেত্রে। কলকাতায় খাটালে গরু রাখা নিষেধ হলেও পাড়ায় পাড়ায় জবাই করার জন্যে আনীত গরুর ক্ষেত্রে সরকার কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না। উক্ত বিষয়গুলির উপর বিশ্ব হিন্দু পরিষদ থেকে বিভিন্ন সংবাদপত্র ও চ্যানেল নীরব।

স্বপন কুমার দত্ত, কলকাতা - ২৭

আজানি

একটা বাস্তব সমস্যায় দীর্ঘ বছর যাবৎ ভুগছি। সেটা হচ্ছে তীব্র শব্দ দূষণের সমস্যা। তখন রমজান মাস। ঠিক রাত আড়াইটা থেকে রোজা পালনের জন্য মাইকের মাধ্যমে নির্দেশ দেওয়া হয়। এই তীব্র চিৎকার চলে ভোর চারটে পনেরো পর্যন্ত। এ যে কী যন্ত্রণা তা ভুক্তভোগীরাই জানে। পশ্চিমবঙ্গে সর্বত্র এই নির্যাতন চলছে। বছরের অন্য সময় সারা বছর ঠিক রাত সাড়ে তিনটের সময় তীব্র চিৎকার করে 'আজান' দেওয়া হয়। আমাদের রাতের ঘুম আর নেই।

আপনার পত্রিকাতে এ বিষয়ে আলোকপাত করলে হয়তো একদিন ফল হবে। আমাদের রাতে একটু ঘুমোবার ব্যবস্থা দয়া করে রাজ্য সরকার করে দিন।

শুকতারা সরকার, জয়নগর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা।

অপভাষা অনুপ্রবেশের মতো একটি যুদ্ধ

(৮ পাতার পর)

কোনও অনুষ্ঠানে নির্ভেজাল বাংলা ভাষা ব্যবহার করা হয় না। শুধু বাংরিজি। এগুলো কোনওটাই অনিচ্ছাকৃত নয়। ইচ্ছাকৃত এবং পরিকল্পনা মাফিক। সংস্কৃতিকে নষ্ট করতে হবে। বাংরিজি নামধেয় একটি দূরদর্শন প্রতিষ্ঠানের "লক্ষ্মীর বয়ফ্রেন্ড", "সরস্বতীর ফেল করা" "কার্তিকের গার্লফ্রেন্ড উধাও" ইত্যাদি অনাচার ও ব্যভিচার ক্লিষ্ট প্রচারপত্র দুর্গাপূজায় নিশ্চই দেখেছেন। মা দুর্গার ভাসানে অশ্লীল ভাবে ধাক্কা দিয়ে জলে ফেলে দেওয়া — ভাসান হয়ে গেল। এ অনাচার-ব্যভিচার কারা করছে? মূলত তরুণ সমাজ। যারা কাউকে মানে না। রক্তের মধ্যেই যেন এই অমান্যতা। কেন? সচেতনভাবে সৃষ্টি করা বেকারী, দারিদ্র, অর্থনৈতিক হতাশা, হাহাকার। তাই কারও এই অনাচার ব্যভিচারে ভ্রুক্ষেপ নেই।

বিপ্রতীপ হলেই দায়িত্ব নিতে হয়। কঠিন সে পরিশ্রম। সেই জন্যই রাজা রামমোহন নির্বিকার। বিদ্যাসাগর শিথিল। বিষ্ণুগুপ্তের মতো ফণা তুলে ধরলো স্বামীজী, নেতাজী, ডাক্তারজী। দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিলেন তাঁরা। সংস্কৃতি নষ্ট করার দীর্ঘকালীন ষড়যন্ত্রের সঙ্গে আরেকটি মাত্রা এই ষড়যন্ত্রের অভিযানে যুক্ত হল — স্বামীজী-নেতাজী - ডাক্তারজীর আবহ যেন শিকড় সৃষ্টি করতে না পারে। অতিনিকট ভবিষ্যতে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় তরুণ সমাজ — প্রতিভা সম্পন্ন ভারতীর যুব সমাজ আর তার অমিত ক্ষমতাশালী মাতৃশক্তি — নারী সমাজ। এই দুই সমাজকে বেপথু করতে হবে।

৮. ভারতবর্ষের প্রচার মাধ্যম শ্রীরামপুরের "সমাচার" বা হিকির জার্নাল থেকে আজ পর্যন্ত সাম্প্রতিক কিছু ক্ষেত্র ছাড়া, ভারতবিরোধীই রয়ে গেছে। বৃটিশ সৃষ্ট কংগ্রেস এবং বৃটিশ সৃষ্ট কম্যুনিস্ট পার্টির নামে দেশভাগের জন্য যতই দোষারোপ করি না কেন — ভারতের প্রচার মাধ্যমই আসলে সাম্রাজ্যবাদীদের নির্দেশে এই কাজটি সমাধা করেছে — এটি কিন্তু বাস্তব সত্য। ঐতিহাসিকরা আশা করি এদিকটা না ভেবে ভুল করবেন না। বর্তমান ভারত -বিরোধী এই প্রচার মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থে (অর্থাৎ পুরানো মিত্র শক্তির স্বার্থে অথবা আরও স্পষ্ট ক'রে বললে পাশ্চাত্যের সমর্থন পুষ্ট আমেরিকার স্বার্থে) আমাদের যুব সমাজ ও নারী সমাজকে স্বদেশ সমাজ নিরপেক্ষ তথা দেশপ্রেম স্বজাতি প্রেমহীন ক্লীব জীবে পরিণত করার উদ্দেশ্যে সংস্কৃতি নষ্ট করার অভিযান। বাজারী পত্রিকা বানান সংস্কার করছে (ঐতিহ্য ভুলিয়ে দিতে হুবহু স্ট্যালিনীয় পদ্ধ তিতে এবং উদ্দেশ্যে), চুরি করা ডঃ সরকার-এর সাধারণের উচ্চারণ অনুযায়ী বানানের তত্ত্বকে (যা'র কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই) দৃষ্টিকটু ভাবে প্রচার করা। অথচ দেখুন পবিত্র বাবুর নিজের পার্টির নাম সাধারণে যেভাবে উচ্চারণ করা হয় সেভাবে অর্থাৎ সি পি আই (এম) না বলে সিপিএম বললে সরকারবাবুর নেতা বিমানবাবু গোঁসা করেন। বাজারী পত্রিকার ঐ সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্য সফল করার জন্যই সাম্রাজ্যবাদী পবিত্রবাবুর ওই তাত্ত্বিক আস্ফালন।

৯. বর্তমান বিজ্ঞাপনে, পোষাকের ব্যবসায়ে, চলচ্চিত্রে প্রচার মাধ্যমে (বিশেষ ক'রে বৈদ্যুতিন মাধ্যমগুলিতে) নারীদেহের (অতি সম্প্রতিককালে-পুরুষদেহেরও) অশ্লীল ব্যবহার একদিকে নারীকে পাশ্চাত্য সমাজের মতো পণ্যে পরিণত করা হচ্ছে (যা'র ফলে আজ আমাদের 'মা' হারিয়ে যাচ্ছে)। অন্যদিকে তরুণ সমাজকে উচ্ছৃঙ্খল যৌনকামী করে তোলা হচ্ছে। স্বদেশ থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। মনে রাখবেন, ভারতীয় তরুণদের সঙ্গে প্রতিভার দৌড়ে আমেরিকা, ইংলন্ড, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানী, স্পেন ইত্যাদি পাশ্চাত্য দেশগুলি হেরে গিয়ে রাগে দিশেহারা হয়ে ভারতীয় তরুণদের উপর একের পর এক আক্রমণ ক'রে চলেছে। এই তরুণ সমাজকে নষ্ট করা চাই — তাই শ্রী রায়ের উল্লেখিত "অপভাষা" যা আসলে ব্যভিচার এবং অনাচার। একটু লক্ষ্য করলেই এটা পরিষ্কার যে, যেসব ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞাপনে বাংরিজি বা ইংরাজী হরফে বাংলা প্রচার করছে, যৌনতা বিলোচ্ছে, খিস্তি খেউড়ের প্রচার করছে — তথা বিনোদন বা "এন্টারটেনমেন্ট" জগতের মূলধন সরবরাহকারী — প্রত্যেকেই বহুজাতিক সংস্থা বা ঐ সব সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে কংগ্রেস-কম্যুনিস্টদের মতো বিক্রীত সত্ত্বাধারী।

অতএব লেখক শ্রী রায় যে দিকের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন সেটি সাধারণ একটি শালীনতার "অপভাষা" জনিত সমস্যা নয় — একটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অনাচার ব্যভিচার (যা শাস্তি যোগ্য অপরাধ) এবং এগুলি আসলে অনুপ্রবেশের মতোই একটি যুদ্ধ ঘোষণা — সার্বিক আক্রমণ। এই যুদ্ধে স্বস্তিকা — শ্রী রায়েদের মতো লেখকদের নিয়ে আমাদের নেতৃত্ব দিক। এছাড়া যে নান্য পন্থাঃ।

পরম্পরা

প্রভু নিত্যানন্দ প্রবর্তিত পাঁচশো বছরের কাত্যায়নী দুর্গাপুজো

প্রণব রায়

খড়দহ গোস্বামী পাড়ার 'গোপীনাথ বাড়ি'তে প্রভু নিত্যানন্দের বংশধর 'মোহন' পরিবারের 'মেজো বাড়ির কাত্যায়নী দুর্গার পুজো এবছর নিয়ে চারশ আঠাত্তর বছরে পড়ল। প্রভু নিত্যানন্দ পুরন্দর পণ্ডিতের আমন্ত্রণে খড়দহে এসে 'কুঞ্জবাড়ি'তে তাঁর দুই পত্নী বসুধা ও জাহ্নবী দেবীকে নিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন এবং সেখানে থেকে সমগ্র বাংলায় মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আদেশে হরিনাম ঘরে ঘরে প্রচার করেন। 'হরিমন্ত্রে'র দ্বারা ভক্তসমাজকে মাতিয়ে তুললেও আনুমানিক ১৫৩০ খৃস্টাব্দে তিনি কাত্যায়নী দুর্গা পূজা শুরু করেন।

প্রভু নিত্যানন্দ প্রতিষ্ঠিত কাত্যায়নী দুর্গাপূজার কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, যা অন্য কোনও পূজায় দেখা যায় না। এখানে দেবী মূর্তির উচ্চতা চার ফুটের বেশি নয়। দেবী কাত্যায়নীরূপে পূজিতা। জানা যায়, মা দুর্গার ষষ্ঠরূপ ঋষি কাতার পুত্র মহর্ষি কাত্যায়ণ বহু বছর ধরে ভগবতীর আরাধনায় কঠোর তপস্যা করলে দেবী তাঁর প্রতি প্রসন্ন হন। তিনি তখন তাঁর গৃহে কন্যারূপে আবির্ভূতা হন। এরপর অসুরের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তাঁদের তেজঃ শক্তি দিয়ে এক দেবীকে সৃষ্টি করেন। মহর্ষি কাত্যায়ণ সেই দেবীকে আরাধনা করায় দেবী কাত্যায়নী নামে প্রসিদ্ধা হয়ে ওঠেন।

'গোস্বামী পাড়ায়' 'মেজবাড়ি'র কাত্যায়নী দেবী দুর্গা প্রতিমার বৈশিষ্ট্য হলো, প্রতিমার বাম ও ডানদিকে সরস্বতী ও লক্ষ্মীর পরিবর্তে জয়া ও বিজয়ার মূর্তি। সরস্বতী ও লক্ষ্মীর সে কারণে কোনও বাহনও উপস্থিত নেই। আরও উল্লেখযোগ্য, দেবীর পদতলে সিংহের পরিবর্তে ঘোড়া। অনেক পুরানো বনেদী বাড়িতে অশ্বাকৃতি সিংহ এখনও লক্ষ করা যায়। হয়তো আদিতে এখানে অশ্বাকৃতি সিংহই ছিল। পরে এটি ঘোটকে পরিণত হতে পারে। কারণ এখানে ঘোটকের পায়ের খুর কৃষ্ণবর্ণ। কার্ত্তিক, গণেশ অবশ্য 'মেড়' বা 'চালচিত্রের' দুপাশে বর্তমান। সব মূর্তি এই চালচিত্রে সন্নিবেশিত।

চালচিত্রের নিচের দিকে একপাশে দেবী মূর্তির ডানদিকে নবদুর্গা বা 'কলাবৌ'য়ের পরনে 'থান' কাপড়। কিন্তু থানের ওপর থেকে নিচে লম্বা করে সিঁদুর দেওয়া থাকে। জানা যায়, প্রভু নিত্যানন্দ যখন পূজায় ব্যস্ত, তখন দান হিসেবে তাঁর কাছে একটি 'থান' কাপড় আসে। সেটি কলা বৌকে পরিয়ে তাতে সধবার চিহ্নস্বরূপ সিঁদুরের লেপ দেওয়া হয়। সেই প্রথা আজও চলে আসছে।

যেহেতু স্বাভাবিকভাবেই বৈষ্ণব মতে এই পুজো হয়, তাই পুজোর

প্রভু নিত্যানন্দ প্রবর্তিত কাত্যায়নী দুর্গা।

আরও কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। পুজোয় মাষকলাই বলি দেওয়া হয়। ধারণা, এর ফলে মা দুর্গাকে ঘিরে থাকা ভূত-প্রেত অপদেবতাদের তুষ্ট করা যাবে। প্রতিমা ডাকের সাজে সজ্জিতা। কাত্যায়নী দুর্গা প্রতিমার রং অতসী পুষ্পের মতো হরিদ্রাভ, ঘোটকের বর্ণ শুভ্র এবং মহিষাসুরের রং সবুজ। মূর্তিগুলির গঠন প্রাচীন শৈলীর।

মূর্তি তৈরির আগে কাঠামো পুজো হয় উল্টো রথের দিন। মহালয়ার আগে নবমী তিথিতে 'মেজবাড়ি'র মা চন্ডী রাধা শ্যামসুন্দর জীউর মন্দিরে যান। পরের প্রতিপদের দিন মা চন্ডীকে 'মেজবাড়িতে আনা হয়। সেই দিন থেকে শুরু হয় চণ্ডীর পুজো। মহাষষ্ঠীর দিন থেকে বোধন পূজা শুরু হয়ে যায়। এরপর দুর্গাকে সিংহাসনে তোলা হয়। পুজোর চারদিন সাত্ত্বিক ভাবে পূজার্চনা চলে।

মহাষ্টমীর দিন বিশেষ পুজো হয়। ওই পূজারতি শেষে গোপীনাথ মন্দিরের অঙ্গনে আত্মীয় কুটুম্ব এবং নিমন্ত্রিতদের প্রসাদ 'ভুরিভোজ' হয়। ভোজ্যদ্রব্যের 'পদ'গুলি সাধারণ হলেও খুবই সুস্বাস্থ্য ও সংখ্যায় বেশি। প্রথমে সরু আতপচালের অন্ন, শুক্তো, মুগের ডাল, হিং দিয়ে বিউলির ডাল, খিচুড়ি, মুগকলাইয়ের ঘন্টো ('মুগবেঁড়ি'), লাউডাঁটা 'চচ্চড়ি', নারকেল কুমড়ি, আলুপোস্ত, বেগুনি (চপ), 'পুষ্পান্ন' বা নিরামিষ পোলাও, মোচার ঘন্ট, ধোঁকার ডালনা, উৎকৃষ্ট ছানাকে চৌকো করে আলুর সঙ্গে ডালনা, আমসত্ত্ব ও খেজুরের চাটনি, উৎকৃষ্ট সুস্বাদু পায়েস, মালপোয়া, বড় রসগোল্লা সন্দেশ ও পানতোয়া। এই ধরনের ভোগ রাধাশ্যামসুন্দরজীউর 'শরৎ রাসেও হয়।

মেজোবাড়ির শ্রীসরোজেন্দ্রমোহন গোস্বামী প্রভু নিত্যানন্দ প্রবর্তিত এই পুজোর ধারাবাহিকতা বজায় রেখে চলেছেন এবং শুদ্ধাচারে এই পূজানুষ্ঠান করে থাকেন। এঁদের পুরোহিত কালীকৃষ্ণ হালদার বংশানুক্রমিক এই পুজোর পৌরোহিত্য করেন। সরোজেন্দ্রমোহনের পূর্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত 'রাসমঞ্চে' এই পুজো প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হয়।

প্রায় পাঁচশ বছর আগে প্রভু নিত্যানন্দ প্রবর্তিত এই কাত্যায়নী দুর্গাপুজো আজও সকলের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয়। পুজোর কয়েকদিন এখানে বহু ভক্ত সমাগম হয়। ঢাকের বাজনা ও শুদ্ধাচারে পূজানুষ্ঠান পূজার প্রকৃত পরিবেশ সৃষ্টি করে।

শ্রীরাম জনক রাজা দশরথ

নন্দলাল ভট্টাচার্য

তুমি, তুমি একথা বলছো। বলতে পারছো!

বিস্ময়ে হতবাক রাজা দশরথের কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসে এই কথা দুটি, মহারথী তিনি। জীবনে বহু যুদ্ধ করেছেন। বহুজনকে নিহত করেছেন। শত্রুর অস্ত্রকে অনায়াসে ব্যর্থ করে প্রত্যাঘাত করেছেন তিনি। তাঁর এই বীর্য, এই বীরত্বের জন্যই দেবতারাও নানা সময়ে সাহায্য নিয়েছেন তাঁর। ইক্ষ্বাকুবংশের কুলতিলক সেই রাজা দশরথ কিন্তু বিভ্রান্ত এক নারীর বাক্যবাণে।

রাজা বারবার ভাবেন এ কী সেই কৈকেয়ী, যে সব সময় তাঁর কল্যাণ করার জন্যই ব্যস্ত। শুধু প্রাসাদে সুখের সময়ে নয়, সমরক্ষেত্রে যে দাঁড়িয়েছে তাঁর পাশে, রথের চাকার খিল খুলে যাওয়ায় যে নিজের কথা না ভেবে আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে রক্ষা করেছিল রথ, এ কি সেই কৈকেয়ী!

সেটা ছিল দেবাসুরের সংগ্রাম। অসুররাজ শম্বরের সঙ্গে দেবতাদের সেই যুদ্ধে দেবতাদের আমন্ত্রণেই দশরথ অবতীর্ণ হয়েছিলেন সমরে। সে যুদ্ধে কৈকেয়ী ছিলেন তাঁর সঙ্গিনী। মাত্র আধঘন্টার মধ্যে সমস্ত অসুর সৈন্য ধ্বংস করলে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে অসুরশক্তি শম্বর। মায়া বলে নিজেই দশ ভাগে বিভক্ত হয়ে দশদিক থেকে আক্রমণ করে সে রাজাকে। আর রাজা দশরথ, তিনিও অতি ক্ষিপ্রতায় রথকে দশদিকে আবর্তিত করে একা একইসঙ্গে দশ শম্বরের সঙ্গে যুদ্ধ করে বধ করেন অসুরকে।

সে দিনের সেই যুদ্ধে রাজার ওই অপূর্ব বীরত্ব দেখে তাঁকে সকলে নেমি দশরথ নামে অভিহিত করে। সে যুদ্ধে কৈকেয়ী পাশে থেকে যেভাবে রাজাকে সাহায্য করেছিলেন, যেভাবে আহত রাজাকে সেবা করেছিলেন, তাতে পরিতুষ্ট রাজা বলেছিলেন, কৈকেয়ী তোমার সেবায় আমি প্রীত। তোমায় আমি দুটি বর

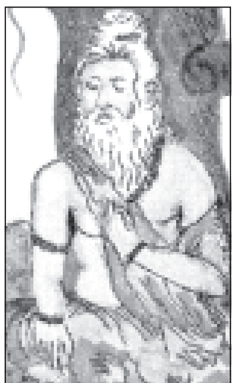

অবতার পুরুষের পিতা

দিতে চাই। বল কী বর নেবে।

রাজার ভালোবাসায় অভিভূত কৈকেয়ীর ওই মুহূর্তে আর কোনও কিছুরই দরকার ছিল না। রাজার বক্ষলগ্না কৈকেয়ী বলেছিল, আজ আর কিছুই আমার চাওয়ার নেই। পরে যদি প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে আমি নিজেই চেয়ে নেব। তার জন্য তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না এখন।

কৈকেয়ীর এই সংযমে আরও খুশী হয়েছিলেন রাজা দশরথ। তাকে তিনি আরও নিবিড় করে টেনে নিয়েছিলেন। সেদিন এক মুহূর্তের জন্যও আর কিছু মনে হয়নি রাজার। তাই কথা দিয়েছিলেন, ভবিষ্যতে কৈকেয়ী এই বর দুটি চাইলে, তিনি সানন্দেই তা দেবেন তাকে। মুহূর্তের জন্যও ভাবেননি রাজা, এমন ভয়ঙ্কর হবে সেই কথা দেওয়ার ফল।

রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করে তারই হাতে রাজ্যের শাসনভার তুলে দেবার আয়োজন করেছিলেন রাজা দশরথ। আর সেই মুহূর্তে কৈকেয়ী চাইলেন তাঁর সেই দুটি বর। এক বরে ১৪ বছরের জন্য রামের বনবাস, অন্য বরে নিজের ছেলে ভরতের জন্য সিংহাসন।

এমনই এক অনভিপ্রেত প্রার্থনায় হতচকিত রাজা দশরথ। রাজা বেদজ্ঞ। ধর্মজ্ঞ। মহাবীর। জিতেন্দ্রিয় এমন কথাও বলা হয়। তবে বাস্তবে অন্য সব ইন্দ্রিয়কে জয় করলেও কামকে পরাভূত করতে পারেননি তিনি। তাই একটি দুটি নয়, ৩৫৩ জন নারীকে তিনি দিয়েছিলেন স্ত্রীর মর্যাদা। কৌশল্যা, কৈকেয়ী এবং সুমিত্রা — রাজকন্যা। এরাই রাজা দশরথের প্রধান মহিষী। কিন্তু এই তিন ক্ষত্রিয় কন্যা ছাড়াও ছিলেন শূদ্র ও বৈশ্যকন্যা যাদের সংখ্যা সাড়ে তিনশ। রাজার বৈশ্য স্ত্রীদের বলা হয় বাবতা এবং শূদ্রা স্ত্রীদের পরিবৃত্তি।

তিন প্রধান মহিষী থাকা সত্ত্বেও ক্ষত্রিয়েতর আরও ৩৫০ জন নারীকে বিয়ে করাটা কখনই জিতেন্দ্রিয় হওয়ার লক্ষণ নয়। এই রকম ইন্দ্রিয়পরায়ণ হওয়ার জন্যই অগ্রপশ্চাৎ না ভেবেই কৈকেয়ীকে তিনি কথা দিয়েছিলেন তাঁর মনোমতো দু'টি বর দিতে। এক্ষেত্রে কৈকেয়ী স্ত্রী ধর্ম থেকে বিরত হলেও মাতৃধর্মে ছিলেন অবিচল। সব মা-ই যে কোনও অবস্থাতেই নিজের ছেলের জন্য সম্পদ বা সুখ কামনা করে থাকে। সেদিক দিয়ে বিচার করলে কৈকেয়ী তেমন গুরুতর কোনও অন্যায় করেননি। কিন্তু দশরথ ইন্দ্রিয়পরায়ণ হওয়ার কারণেই পরম আনন্দের মধ্যে ঘটেছিল অমন বিয়োগাত্মক একটি ঘটনা।

তবে এসবই ছিল পূর্ব নির্দিষ্ট। রাক্ষসরাজ রাবণের হাত থেকে পৃথিবী এবং দেবতাদেরও রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ভগবান বিষ্ণু। সেই প্রতিশ্রুতি রাখতেই রাম অবতারে তাঁর এই পৃথিবীতে অবতরণ। যে কাজের জন্য তাঁর এই আসা, সেটি সুচারুভাবে সমাধা করার জন্যই হয়তো প্রয়োজন ছিল এই পটভূমির। সেই সঙ্গে চরম শিক্ষা, কামের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ কখনই নয় তাতে ঘটতে পারে চরম বিপদ।

দশরথ ইন্দ্রিয়পরায়ণ, কিন্তু অসংযমী নন। দশরথ ছিলেন ধর্মজ্ঞ এবং যজ্ঞানুষ্ঠান পরায়ণ। তিনি করেছিলেন অশ্বমেধ যজ্ঞ। অশ্বমেধ যজ্ঞের পর তিনি করেন পুত্রেষ্টি। এই যজ্ঞের প্রধান পুরোহিত ছিলেন রাজা দশরথেরই জামাতা শান্তার পতি বিভণ্ডকের ছেলে ঋষ্যশৃঙ্গ। যজ্ঞে উপস্থিত হন দেবতারাও। এখানে ব্রহ্মাকে দেবতারা স্মরণ করিয়ে দেন রাবণের অত্যাচারের কথা। ব্রহ্মাও তখন বিষ্ণুকে রাজা দশরথের পুত্র হয়ে জন্ম নিয়ে রাবণ বিনাশের জন্য অনুরোধ করেন। এই যজ্ঞের ফলেই দশরথ হন অবতার পুরুষ রামচন্দ্রের পিতা।

অধঃপতন

নিজস্ব প্রতিনিধি।। বর্ধমান মহাবীর তখন আশ্রমে। অন্যান্য শিষ্যদের সঙ্গে গল্প করছেন। অন্যদের মতামত নিচ্ছেন। এমন সময় হঠাৎ এক শিষ্য এসে হাজির। মাঝ বয়সী শিষ্যটি মনমরা হয়ে তাঁর সামনে দাঁড়ালেন। মহাবীর মনে মনে বুঝলেন — নিশ্চয় কোনও না কোনও চিন্তা শিষ্যের মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। মহাবীর তাঁকে শান্ত করলেন। বললেন, বসো। কি হয়েছে তোমার? আবার কি সমস্যায় পড়েছ তুমি! শিষ্য বললেন, মহারাজ, কোনও সমস্যা নয়। অনেকদিন থেকে আমি একটা কথা বারবার চিন্তা করছি। কেন মানুষের জীবনে অধঃপতন আসে। দুঃখ আসে। কি কারণেই বা মানুষ পশুতে পরিণত হয়। আমি অনেক ভেবেছি, কিন্তু কোনও উত্তরেই ঠিক খুশী হতে পাচ্ছি না। অনুগ্রহ করে আপনি যদি এর ব্যাখ্যা করতেন।

মহারাজ শান্ত করলেন তাঁকে। শান্ত হয়ে বসতে বললেন শিষ্যকে। একটু পরে মহাবীর বললেন, দেখ, তোমার প্রশ্নের উত্তর আমি শুধু একা দেব না। তুমি নিজেও এর কারণ বুঝতে পারবে। এর জন্য আমি তোমাকে কয়েকটি প্রশ্ন করব। সেগুলির উত্তর দিলে তোমার কাছেও তা পরিষ্কার হয়ে যাবে। আচ্ছা, যদি কোনও ভারী কুমন্ডল জলে ফেলা

বোধকথা

হয়, তাহলে তা কি ডুবে যাবে? শিষ্য বেশ জোর গলায় জবাব দিলেন, 'না না মহারাজ। কুমন্ডলটা ডুববে না।'

মহারাজ — কুমন্ডলের যদি বামদিকে একটি ছিদ্র করে দেওয়া হয়, তাহলে কি কুমন্ডলটা আগের মতো জলে ভাসতে পারবে?

শিষ্য — না, কুমন্ডলটা তো তাহলে জলে ডুবে যাবে। ভাসতে পারবে না।

মহারাজ — কুমন্ডলের ছিদ্রটি যদি বামদিকে না হয়ে অন্যদিকে হয়, তাহলে কি তা ডুবে যাবে?

শিষ্য — মহারাজ, ছিদ্র যেদিকেই হোক না কেন, তা ডুবে যাবে। বাঁদিকে-ডানদিকে বলে কোনও কথা নেই। ছিদ্র হলেই তা ডুববে।

মহারাজ বললেন, তুমি ঠিক বলেছ। মানুষের জীবনও অনেকটা এরকমই। আমাদের জীবনেও যদি কু-অভ্যাসের ছিদ্র জন্ম নেয়, বুঝতে হবে কুমন্ডল ডুবে যাওয়ার মতোই, তারও অধঃপতন শুরু। অসৎ ছিদ্রই মানুষকে ক্রমশ অন্ধকারে ঠেলে দেয়। কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা অহঙ্কার মানুষকে অধঃপতনের দিকে ঠেলে দেয়। যদি মানুষ শুরুতেই তার দোষ-গুণ বুঝতে পারে, তবে পতন ঠেকানো সম্ভব। প্রথমেই নিজেকে শুধরানোর প্রয়োজন। প্রয়োজন প্রকৃত মানুষ রূপে সর্বদা স্বচ্ছ রাখা। চরিত্রের যে কোনও ছিদ্র মানুষকে অন্ধকারে ঠেলে দেয়।

।। চিত্রকথা ।। হনুমান ও ভীম ।। ৬

জীবনে বিজ্ঞান

।। নির্মল কর।।

টক থেরাপি

উদ্বেগ, নিদ্রাহীনতা এবং সব সময় মন খারাপে একগাদা অ্যান্টি-অ্যাংজাইটির ট্র্যাঙ্কুলাইজার না খেয়ে টক থেরাপির সাহায্যের পরামর্শ দিয়েছেন আমেরিকার মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের গবেষকরা। কারণ, দীর্ঘদিন ধরে এসব ওষুধ সেবনের অর্থ ওষুধের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়া। ফলে স্বাভাবিক নিয়মে ঘুম আসতে চায় না। স্ট্রেস লেভেলও বেড়ে যায়। পরন্তু ট্র্যাঙ্কুলাইজার গ্রুপের ওষুধ অতি ব্যবহারে হঠাৎ করে পড়ে যাওয়া, হিপ্ জয়েন্ট ফ্যাকচার হওয়ারও ভয় থাকে। তাই তাঁরা টক থেরাপির অপরিহার্যতার কথা বলেন। টক থেরাপির বৈজ্ঞানিক নাম সি বি টি বা কগনেটিভ বিহেভিয়ার থেরাপি-এর মাধ্যমে দূর হয় মানসিক অবসাদ, ক্লান্তি এবং অন্যান্য শারীরিক অসুস্থতা।

অন্ধত্ব ঠেকাতে জাফরান

নিজের দৃষ্টিশক্তি রক্ষা করতে আজ থেকে শুরু করুন জাফরানের ব্যবহার। বয়স্কদের ভিশন রক্ষা করতে অথবাচোখের অন্যান্য রোগের কারণে চোখের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হওয়া থেকে বাঁচায় এই ভেষজটি। ইতালির এ আর সি সেন্টার অব্ এক্সেলেন্স ইন ভিশন সায়েন্স-এর গবেষকরা সম্প্রতি নানা পরীক্ষার পর প্রমাণই করেছেন, যে কোষগুলি দৃষ্টিশক্তি ঠিক রাখতে সাহায্য করে, সেগুলোকে আরও উন্নত করে তোলে এবং সব রকম ড্যামেজ থেকেও রক্ষা করে জাফরান। এমন কী যাদের 'এজ রিলেটেড ম্যাকুলার ডি-জেনারেশন' (AMD) হয়েছে, তাদের অন্ধত্ব কাটাতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে ক্রোকাস ফুল থেকে তৈরি এই লাল রঙের ভেষজ। স্লো-ব্লাইন্ডনেস, যা লেখা পড়া এবং ড্রাইভিং-এর পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তা থেকেও রক্ষা করে জাফরান।

পানমশলায় স্মৃতিলোপ

দীর্ঘদিন পানমশলা, সিগারেট এবং অন্যান্য তামাকজাত দ্রব্যাদি সেবন করলে চিরদিনের জন্য স্মৃতি লোপ পেতে পারে, অকেজো হয়ে যেতে পারে মস্তিষ্ক কোষ। ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর নিউরো কেমিস্ট্রিজ জার্নাল অব্ অনলাইন এডিশনে পান মশলা ও সিগারেট মস্তিষ্ক কোষের কীভাবে ক্ষতি করে সে সংক্রান্ত যে গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছে, তা থেকে জানা যায়, সিগারেটের ধোঁয়ায় 'এন এন কে' নামে এক ধরনের নাইট্রো-সেমাইন, যা ক্যান্সার সৃষ্টিতে কার্যকর ভূমিকা নেয়। এছাড়া শরীর বৃত্তীয় কার্যকলাপচক্রের জেরে শ্বেতকণিকার সঙ্গে জোট বাঁধে। এই পর্যায়ে শ্বেত কণিকাগুলি এন এন কে'র সাহায্যে মস্তিষ্কের সুস্থ কোষগুলিকে আক্রমণ করে। শুরু হয় মস্তিষ্কের প্রদাহ। ফলে স্মৃতিলোপ পেতে থাকে।

র ঙ্গ কৌ তু ক

রঙ্গ কৌতুক

শিক্ষক ঃ ১৮৬৯ সালে কোন্ ঐতিহাসিক ঘটনাটি ঘটেছিল?

ছাত্র ঃ ওই বছর মহাত্মা গান্ধী জন্মেছিলেন।

শিক্ষক ঃ আর ১৮৭২ সালে কী ঘটেছিল?

ছাত্র ঃ গান্ধীজীর বয়স হয়েছিল তিন বছর।

☺ ☺ ☺

প্রশ্ন ঃ টাকা নাকি কথা বলে?

উত্তর ঃ বলে বৈকি, আমার কাছে এসেই শুধু যাই যাই করে।

☺ ☺ ☺

নন্টে (কাঁদতে কাঁদতে) ঃ জানিস, অ্যাকসিডেন্টে আমার একটা আঙুল কাটা গেছে।

ফন্টে ঃ তাতেই কাঁদছিস! ওই লোকটাকে দেখ, মাথা কাটা গেছে তবুও কেমন চুপ করে আছে!

☺ ☺ ☺

— আমরা তিন ভাই বরাবরই দুঃসাহসী;এক ভাই তো একা একটি বাঘের সঙ্গে লড়েছিল।

— বটে! তারপর কী হলো?

— আমরা দুই ভাই হয়ে গেলাম।

☺ ☺ ☺

ছেলে ঃ বাবা, আমাদের কুকুরটাকে পাওয়া যাচ্ছে না।

বাবা ঃ ভেবো না, কাগজে বিজ্ঞাপন দেব।

ছেলে ঃ কিন্তু কুকুরটা যে পড়তে পারে না।

—নীলাদ্রি

ম গ জ চ র্চা

১। কোন বিপ্লবী দলের গুপ্ত সাংকেতিক চিহ্ন ছিল ৪৯?

২। 'হুমায়ুননামা' গ্রন্থটি কার লেখা?

৩। কোন্ রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে লোহা রাখলে লোহা নিষ্ক্রিয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়?

৪। মৃগ চলে যে পথে সে পথের নাম কী?

৫। ১৯৪৫-এর ৬ আগস্ট আমেরিকা জাপানের হিরোশিমায় 'লিটল বয়' নামে একটি বোমা ফেলে। ওই বছর ৯ আগস্ট নাগাসাকির ওপর যে-বোমাটি ফেলে তার নাম কী?

—নীলাদ্রি

উত্তর ঃ

১। অনুশীলন সমিতি

২। গুলবদন বেগম

৩। গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিড

৪। বীথি

৫। ফ্যাটম্যান

সমাবেশ সমাচার

শ্রমিক ও কৃষকদের অবহেলাই দারিদ্র্যের মূল কারণ — বিএমএস

৬২ বছর ধরে গ্রামীণ ক্ষেত্রে শ্রমিক ও কৃষকদের অবহেলাই তাদের দরিদ্র্যের মূল কারণ। এদেশে বাজেটের অতি সামান্য অংশই গ্রামীণ ক্ষেত্রে খরচ করা হয়। ইউ পি এ সরকার চলতি বছরের বাজেটে গ্রামীণ ক্ষেত্র রোজগার প্রকল্পে কোনও আর্থিক বরাদ্দ করেনি। সম্প্রতি নদীয়ার ধুবুলিয়াতে গ্রামীণ শ্রমিকদের এক সম্মেলনে ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কে লক্ষ্মা রেড্ডি এই অভিযোগ করেন। সম্মেলনে সর্বভারতীয় স্তরে বিএমএসের এবিষয়ে আন্দোলনে নামার কথাও জানান তিনি। ওই সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পূর্বক্ষেত্রের সহ প্রমুখ ব্রজেন দাস, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সভাপতি প্রিয়ব্রত দত্ত, রাজ্য সহ-সভাপতি বাবাজী পরিধা, রাজ্য সম্পাদক মানবেন্দু বসু সহ আরও অনেকে।

ভারত উদয়ের পুরস্কার বিতরণ

সম্প্রতি দার্জিলিং জেলার কালিংপঙের রামকৃষ্ণ রঙ্গমঞ্চ -এ এক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অখন্ড ভারতের গৌরবময় অতীত, বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ ভাবনা — এই বিষয়ে এক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে ভারত উদয়। প্রথম পুরস্কার হিসাবে নগদ ৫,০০০ টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার তিন হাজার ও তৃতীয় পুরস্কার হিসাবে দু'হাজার টাকা প্রদান করা হয়। হিন্দী, নেপালী ও ইংরেজী ভাষার মধ্যে যে কোনও একটি ভাষায় প্রবন্ধটি লিখতে বলা হয়েছিল। প্রবন্ধের সর্বোচ্চ শব্দ সংখ্যা ৫০০০ পর্যন্ত নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। ১৯৮ জন প্রতিযোগী এতে অংশ নেয়।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অভিনেত্রী স্মৃতি ইরানী। মুখ্য অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কালিংপঙ কলেজের অধ্যক্ষ আর বি ডুজবল। অনান্যদের মধ্যে ছিলেন চন্দ্রশেখর রাও, প্রকাশমণি প্রধান সহ আরও অনেক বিশিষ্ট জন। এদিন পুরস্কার বিতরণের পাশাপাশি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। এতে বিভিন্ন স্কুলের বিদ্যার্থীরা অংশ নেয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারত উদয় জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় পুষ্ট স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। যুব সমাজের মধ্যে জাতীয়তাবোধ, নৈতিকতা বিকাশে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে ভারত উদয়। ভারত উদয়ের প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা গুণীজনদের কাছেও বিশেষভাবে সমাদৃত হয়।

ইস্টার্ন মেকার্স ফোরামের সেবাকাজ

'ইস্টার্ণ ইন্ডিয়া মিউজিক ভিডিও অ্যালবাম মেকার্স ফোরাম' গত ৫ সেপ্টেম্বর সুন্দরবনের আয়লা বিধবস্ত এলাকায় প্রায় শতাধিক শিশু, কিশোর এবং কিশোরীদের নতুন বস্ত্র বিতরণ করে। সহযোগিতায় ছিল 'মাইকেল মধুসদন দত্ত ফাউন্ডেশান'। ফ্রক, সালোয়ার কামিজ, সার্ট, হাফপ্যান্ট, স্যান্ডো গেঞ্জি, লুঙ্গি, শাড়ি এবং গামছা বিতরণ করা হয়। সংগঠনের সভাপতি শিবাশিস দত্ত এই সংবাদ জানান।

শোক সংবাদ

চলে গেলেন বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী দেবীপ্রসাদ সেনগুপ্ত। দীর্ঘদিন রোগ ভোগের পর ৯৮ বছর বয়সে বীরভূমের লম্বোদরপুরে নিজের বাসভবনে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তরুণ বয়সে তিনি স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় কারাবরণও করেন তিনি। সরকার তাঁকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করতে চাইলেও, তিনি তা নেননি। প্রয়াত দেবীপ্রসাদ সেনগুপ্ত তাঁর নিজের জায়গা দান করেন স্বয়ংসেবকদের পরিচালিত শিশু মন্দির নির্মাণের উদ্দেশ্যে। তাঁর পরিবারও সঙ্ঘ অনুরাগী। পুত্ররা সঙ্ঘের বিবিধ ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত। দু'বছর আগে 'শ্রদ্ধা' নামক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পক্ষ থেকে প্রয়াত সেনগুপ্তকে সম্মানিতও করা হয়।

মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, পাঁচ পুত্র ও তিন কন্যা রেখে গেছেন।

শোক সংবাদ

বাঁকুড়া জেলা বিজেপির প্রাক্তন সহ-সভাপতি চিত্তরঞ্জন চ্যাটার্জি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। বাঁকুড়ার কেঞ্জেকুড়ার বাসিন্দা ছিলেন তিনি। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন বাঁকুড়ার বিজেপি নেতৃত্ব।

❖ ❖ ❖

বাঁকুড়া নগরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক ও সরস্বতী শিশু মন্দিরের সভাপতি অধ্যাপক তাপস চট্টোপাধ্যায় গত ৭ সেপ্টেম্বর পরলোক গমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। তিনি দুই পুত্র ও নাতি-নাতনীদের রেখে যান।

❖ ❖ ❖

চলে গেলেন বাঁকুড়া নগরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক গোপীনাথ দাস মোদক। ৩০ সেপ্টেম্বর ৭৬ বছর বয়সে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি হিন্দু মহাসভার আজীবন সদস্য ছিলেন। মৃত্যুকালে দুই পুত্র, এক কন্যা ও নাতি-নাতনীদের রেখে যান।

মঙ্গলনিধি

হুগলী জেলার হরিণাখালি গ্রামে মহকুমা বৌদ্ধিক প্রমুখ চন্ডীচরণ জানা সম্প্রতি তাঁর কন্যার অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠানে ৫০০ টাকার মঙ্গলনিধি প্রদান করেন।

❖ ❖ ❖

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার আমজোড়ের বাসিন্দা তারাপদ মণ্ডল তাঁর ছোট ছেলের বিবাহ উপলক্ষে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কার্যকর্তাদের হাতে মঙ্গলনিধি প্রদান করেন।

নাইকুলিতে ভারতমাতা পূজা

২৪ সেপ্টেম্বর থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ভারতমাতা পূজা উপলক্ষে বিভিন্ন দেশাত্মবোধক সামাজিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে হাওড়া জেলার নাইকুলি ভারতমাতা সঙ্ঘ। ২৪ সেপ্টেম্বর, মহাষষ্ঠীর দিন থেকেই ভারতমাতার পূজার শুভারম্ভ হয়। ভারতমাতার আবরণ উন্মোচন ও সঙ্ঘের পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। ৬দিন ব্যাপী চলা এই কার্যক্রমে কীর্তন, দেশাত্মবোধক গানের নৃত্য প্রতিযোগিতা, ক্যুইজ প্রতিযোগিতা, বসে আঁকো প্রতিযোগিতাসহ আরও অনেক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ভারতমাতা পূজা উপলক্ষে বিশিষ্টজনদের মধ্যে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন হাওড়ার জ্ঞানানন্দ সাধনাশ্রমের স্বামী সেবানন্দ সরস্বতী মহারাজ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ধর্মরক্ষা মঞ্চের সংযোজক স্বামী শিব চৈতন্য মহারাজ সহ আরও অনেকে।

'জগজ্জ্যোতি' শতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ অনুষ্ঠান

বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা প্রকাশিত 'জগজ্জ্যোতি'-র শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত হল এক স্মারক গ্রন্থ গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৯ কলকাতার কৃপা শরণ হলে। দ্বিভাষিক এই স্মারক গ্রন্থটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করলেন ভারত সরকারের সংস্কৃতি সচিব জহর সরকার। প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সুরঞ্জন দাস। সভাপতিত্ব করেন ডঃ বিনয়েন্দ্রনাথ চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন মহাবোধি সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক ডঃ ডি রেবত থেরো। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন ডঃ ভিক্ষু বোধিপাল।

পয়লা নম্বরে আকালি-বিজেপির পাঞ্জাব রাজ্য

(৭ পাতার পর)

হয়। এবার দেখা যাক সমীক্ষার ভিত্তিতে কোথায় আইন-শৃঙ্খলার (ল' অ্যান্ড অর্ডারের) কি পরিস্থিতি। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে দক্ষিণের রাজ্যগুলিই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

যেমন, কেরল, তামিলনাড়ু, গুজরাট ও কর্ণাটক। এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের স্থান সবার নীচে। ছোট রাজ্যগুলির মধ্যে মণিপুর, অরুণাচল ও মেঘালয়ের অবস্থা উদ্বেগজনক।

কিছু রাজ্যের কিছু কথা

ওড়িশার জনগণের একটা বড় অংশ দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করে। ৩৯.৯ শতাংশ দারিদ্র্য সীমার নীচে রয়েছে।

শুধুমাত্র জম্মু-কাশ্মীরে দারিদ্র্য সীমার নীচে থাকা মানুষের শতাংশের হার হল ৪.২ শতাংশ।

দিল্লীতে প্রতি পাঁচ জনের মধ্যে ৪ জনের নিজস্ব টিভি রয়েছে। অন্যদিকে বিহারে প্রতি ৫ জনের মধ্যে মাত্র একজনের টিভি রয়েছে।

দিল্লীর প্রায় প্রত্যেক ঘরে বিদ্যুৎ রয়েছে। সেখানে বিহারে পাঁচটি ঘরের মধ্যে মাত্র১টি ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছেছে। দিল্লীর পরেই রয়েছে পাঞ্জাব।

বিহারে এক লক্ষ জনগণের দেখভাল করে মাত্র ৫০ জন পুলিশ। অর্থাৎ ৫০ জন পুলিশ নিযুক্ত রয়েছে প্রায় ১ লক্ষ জনবসতিপূর্ণ এলাকায়। বিহারের পরই এমন করুণ অবস্থা এই রাজ্যেরও।

বাম জমানায় শিক্ষা ব্যবস্থার ‘জগাখিচুড়ি’

বিকাশ ভট্টাচার্য

সাহিত্য যদি গাছের শিকড় হয় তবে নাটক সেই গাছেরই ফুল ও ফল। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “নাটক ফুলের গাছ, তাহাতে ফুল ফোটে বটে কিন্তু সেই সঙ্গে মূল, কান্ড, শাখা পত্র এমনকি কাঁটাটি পর্যন্ত থাকা চাই।” নাটকে শুধু হাসি, গান, প্রেম ভালোবাসা থাকলেই চলে না। ফুলের সৌন্দর্যের পাশে কাঁটার মতো কঠোর বাস্তবকেও তুলে ধরতে হয়। তাই তো নাটক “সমাজের দর্পণ”। এই বোধ নিয়েই নাট্যকার নির্দেশক বিভাস চক্রবর্তী তাঁর নাটকে কখনও জোতদারের অত্যাচার দেখিয়েছেন (চাক ভাঙ্গা মধু), কখনও শাসকদলের আদর্শ থেকে বিচ্যুতি (অদ্ভুত আঁধার), কখনও লকআপে বন্দী হত্যার নির্মম বাস্তব (মৃত্যু না হত্যা), কখনও আবার আজকের কর্মহীন যুবসমাজের অলীক স্বপ্ন দেখানো রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে জেহাদ (কাল বা পরশু)-কে তুলে ধরেছেন তাঁর বিভিন্ন নাটকে। তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে অবাধ রাজত্ব করেও বাংলার বামফ্রন্ট সরকার স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি মানুষের ন্যূনতম সুবিধেটুকুও দিতে পারেনি। সর্বত্র এক অদ্ভুত নৈরাজ্য!

অন্য থিয়েটার তাদের সাম্প্রতিক নাটক জগাখিচুড়ি-তে সর্বশিক্ষা অভিযান তথা সাক্ষরতার নামে এই রাজ্যে কি চলছে তা তুলে ধরেছেন। গোপাল সরকারের গল্প-তে নাট্যরূপ দিয়েছেন নির্দেশক বিভাস চক্রবর্তী স্বয়ং। শাণিত সংলাপ আর তার তির্যক ভঙ্গীতে সাক্ষরতার সমস্যা আর তার সমাধানের সহজ রাস্তায় আমাদের নিয়ে গেছে এই নাটক।

রাজ্যের সব গ্রাম পূর্ণ সাক্ষর হয়ে গেছে — বাকি শুধু একটি মাত্র গ্রাম। এই গ্রামটিকে যদি সাক্ষর করা যায় তবে রাজ্য হবে পূর্ণ সাক্ষর রাজ্য। তাই আধিকারিক নিজে ছুটে এসেছেন সেই গ্রামে! গ্রামের একমাত্র স্কুলে।

রঙ্গম

স্কুলের দরজায় কোনও সাইন বোর্ড নেই। চিৎকার চেঁচামেচি করায় ধুতির ওপর গামছা জড়ানো খালি গা এক যুবক ছুটে আসে। হাতে তার একটা বিরাট হাতা! আধিকারিকের পরিচয় পেয়ে সে ছুটে ভেতরে চলে যায়। ফিরে আসে জামা গায়ে হাতে স্কুলের একমাত্র ফার্নিচার হাতল-ভাঙ্গা একটা চেয়ার নিয়ে। পরিচয় দেয় সে এই স্কুলের একমাত্র শিক্ষক জগন্নাথ। তবে জগামাস্টার বলেই সবাই জানে। সাইনবোর্ড নেই কেন? জগা জানায় গ্রামের কারও অক্ষরজ্ঞান নেই, সাইনবোর্ড কে পড়বে স্যার? তাই গ্রামপ্রধান ওটা দেননি। ব্ল্যাকবোর্ড, বেঞ্চ, চেয়ার-টেবিল যা ছিল সব চুরি হয়ে গেছে। হ্যাঁ ছাত্র আছে জনা-পঁচিশেক; যদিও খাতায় আছে আশিজনের নাম। ওই হিসেবেই প্রধান মিড-ডে মিলের চাল-ডাল তোলেন। ছাত্র-ছাত্রীরা এসে পড়ল বলে। ওরা আসে মিড ডে মিল খেয়ে চলে যায়। জগন্নাথবাবুকে পড়াতে হয় না। তবে মিড-ডে মিল-এর খিচুড়িটা তাকেই রাঁধতে হয়। এই খিচুড়ির একটা নামও দিয়েছে ছাত্র-ছাত্রীরা — জগাখিচুড়ি।

আধিকারিক জগাকে বলেন তাঁর সমস্যার কথা। তার প্রমোশন আটকে আছে শুধু এই একটি গ্রামের জন্য। জগা বলে সে বিষয়টা নিয়ে অবশ্যই ভাববে। তবে তার বদলির ব্যবস্থা করে দিতে হবে। আধিকারিক রাজি হয়। জগা বলে পড়ার আগে পড়ার আগ্রহ তৈরি করতে হবে। প্রত্যেককে একটা করে পেন দিতে হবে। সবাই বুকে রাখবে। ভেতর থেকে রিফিলটা বার করে ওতে ভরে দিতে হবে মৌরী লজেন্স। কিন্তু গায়ে তো জামা নেই। তাতে কি? মোটা সুতোয় বেঁধে বুকে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। আধিকারিক জগার বুদ্ধি দেখে চমৎকৃত। পেন সাংশন হয়ে যায়। উৎসাহ পেয়ে জগা বলে গ্রাম-প্রধানকে যদি রাজি করান তবে কেল্লা ফতে। কিন্তু পরম বৈষ্ণব প্রধানের এক গোঁ। আগে তার মেয়ের বিয়ে তবে সাক্ষরতা। গ্রাম প্রধানের আধ পাগল বেঁটে কালো মেয়ের জন্য একজনকে পাত্র সাজিয়ে নিয়ে আসেন আধিকারিক। প্রধান সেই পাত্রের পকেট খুঁজে সাকুল্যে মাত্র একশ কুড়ি টাকা পান। পাত্রের চোখে

‘জগাখিচুড়ি’ নাটকের একটি দৃশ্য।

ফ্রেমছাড়া (রিমলেস) হাফ চশমা দেখে গরীব পাত্র ভেবে বাতিল করে দেয়।

এরপর বেশ কিছুদিন গ্রামে আধিকারিকের দেখা নেই। খোঁজ নিয়ে জানা যায় জগাখিচুড়ি (জগার খিচুড়ি) খেয়ে তাঁর জন্ডিস হয়েছে। কিন্তু গরজ যে তাঁর। তাই একটু সুস্থ হতেই আবার গ্রামে পা দিয়েই শোনেন প্রধান জগাকে স্কুল বাড়িতে আটকে রেখে পাহারা বসিয়েছে। কারণ প্রধানের কথায় জগা কাগজের ‘পাত্র চাই’ কলমে এমন সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞাপন দিয়েছে যে পাত্র না এসে আসছে ফোনের পর ফোন। হাউ মাউ খাউ-এর মানে জানতে। পয়সা বাঁচাতে জগা হাফ উন্মাদকে হাউ, মাধ্যমিকে উত্তীর্ণকে মাউ আর খাটো উচ্চতাকে ‘খাউ’— এভাবে ছোট করে বিজ্ঞাপন দিয়েছে। প্রধান খেপে আগুন। আধিকারিক স্কুল বাড়িতে এসে প্রধানকে শাসান — জগাকে ছেড়ে দিতে। না হলে পুলিশে খবর দেবেন তিনি। প্রধান জানায়, সব সমস্যার সমাধান জগা নিজেই করেছে। পুলিশ ডাকতে হবে না। জগা একটু পরেই বের হচ্ছে।

কিছুক্ষণ পর বরবেশে মাথায় টোপর পরে লাজুক জগা বেরিয়ে আসে। সে আধিকারিককে বলে আর তার বদলি নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। সে প্রধানের মেয়েকে বিয়ে করছে। এবার থেকে সে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াবে, আর তার বৌ মিড-ডে মিলে খিচুড়ি রাঁধবে।

নাটকের পরতে পরতে উইট হিউমার আর অলঙ্কারের ছড়াছড়ি। লিখে বোঝানো যাবে না। জগা প্রধানের ছেলেকে পড়াতো। মাথা মোটা ছাত্র তাই কখনও ঢেঁড়শ, কখনও রাঙ্গামুলো বলে কতই না গালাগাল দিয়েছে জগা। প্রধান গা করেনি, যতক্ষণ নিরামিষ ছিল। ছেলে পড়ানোর কাজটা গেল যেদিন ছেলেকে পাঁঠা বলল জগা। বৈষ্ণব বাড়িতে নিষিদ্ধ আমিষ!

শব্দরূপ-৫২৩

কল্যাণ মিত্র

■	■	■	১	■	২		৩
■	৪			■		■	
৫	■	■	৬			■	
৭				■	■	■	
	■	■	■	৮			
	■	৯			■	■	
	■		■	১০			■
১১			■		■	■	■

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ২. বিশ্রাম, আগাগোড়া রসাল ফল, আয়েশ, ৪. পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম বার্ড, ৬. জাহাজ বা স্টিমারে নিযুক্ত নিম্নশ্রেণির কর্মচারী, ৭. আরবি শব্দে প্রকৃত মানুষ, শেষ দুয়ে ইঙ্গ সূর্য, ৮. ঋতু, মৌসুম, প্রথম দুয়ে নশ্বর, ৯. নম্রতা সমার্থে ঘোষ ও মুখোপাধ্যায় গ্রন্থকার, শেষ দুয়ে এক সংখ্যা, ১০. “কি — দেখতে, চোখ দুটো টানা টানা”, ১১. সঙ্গীতের রাত্রিকালীন রাগবিশেষ।

উপর-নীচ ঃ ১. খেলার জগতে ইমরান খান যে নামে খ্যাত, ২. শুষ্ক ছোট আমের টুকরো, শেষ দুয়ে কালি, ৩. নিজের মৃত্যু জেনে শেষবারের মতো দংশন, দুয়ে তিনে যুদ্ধ, শেষ তিনে দন্তাঘাস, ৫. অভাবের সংসারে পরিজনদের পেটুক পনা, ৮. মাঠ, প্রথম দুয়ে দানবশিল্পী, ৯. ইঙ্গ শব্দে এই সভাকে লেজিসলেটিভ অ্যাসেমব্লি বলে।

সমাধান শব্দরূপ ৫২১

ম	■	সু	দা	মা	■	পা	■
য়	■	গ্রী	■	দা	য়া	দ	■
দা	ন	ব	■	র	শৈ	■	■
ন	■	■	■	■	অ	ল	কা
ব	গ	লা	■	■	■	■	র
■	ঙ্গা	■	ফা	■	প	র	ব
■	ধ	র	ণি	■	রা	■	লি
■	র	■	ত	ড়া	গ	■	ক

সঠিক উত্তরদাতা

নীলিমা রায়
নলহাটী, বীরভূম।

● ৫২৩ সংখ্যার সমাধান আগামী ৯ নভেম্বর সংখ্যায়

সবুজ বিপ্লবের জনক নরম্যান আর্নেস্ট বোরলগ

গোপীনাথ দে।। ১৯৬০-এর দশকে ভারতে তখন তীব্র খাদ্য সঙ্কট। বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানির উপর নির্ভরশীল ভারত। আমাদের দেশের কৃষি বিজ্ঞানী এম এস স্বামীনাথন মেক্সিকোর এক গবেষক বিজ্ঞানীর কাছ থেকে উন্নত ও অধিক ফলনশীল গম বীজ আমদানি করিয়েছিলেন ১৯৬৫ সালে। মাত্র ২৫০ টন উন্নত গমবীজ। তখন ভারতে গম উৎপাদন হতো মাত্র ১২৩ মেট্রিক টন। ওই উন্নত গমবীজ ব্যবহারের ফলে কয়েক বছরের মধ্যে ১৯৭০ সালে গমের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াল ২০০ মেট্রিক টন। এম, এস স্বামীনাথন যে ব্যক্তির কাছ থেকে ঐ উন্নত গম বীজ আমদানি করেছিলেন, তিনি মেক্সিকো-এর নরম্যান আর্নেস্ট বোরলগ। ১৯৭০ সালে নরম্যান বোরলগ তাঁর সারা জীবনের কাজের জন্য, উন্নত ও অধিক ফলনশীল বীজ উৎপাদনের জন্য এবং ফসলের রোগ পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য কীটনাশক উদ্ভাবনের জন্য নোবেল শান্তি পুরস্কার পান। ১৯৭০ সালের অক্টোবরে ভোর রাতে যখন তাঁর কাছে নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য তাঁর নাম মনোনীত হওয়ার সংবাদ পৌঁছেছিল, তখন তিনি এক শস্য ক্ষেতে কাজ করছেন। প্রথমে তিনি বিশ্বাসই করতে চাননি নোবেল পুরস্কারের কথা।

১৯৭০ সালে ১১ ডিসেম্বর নোবেল শান্তি পুরস্কার গ্রহণ অনুষ্ঠানে নরম্যান আর্নেস্ট বোরলগ বলেন — "সভ্যতা বলতে আজ আমরা যা জানি, তা আসত না, আর ভবিষ্যতেও তা টিকবে না, পর্যাপ্ত খাদ্য সরবরাহ বিনে। অথচ, পৃথিবীর অর্ধেকের বেশি মানুষ আজ ক্ষুধায় কাতর হলেও খাদ্যশস্য জিনিসটাকে কোনও পাত্তাই দেন না রাষ্ট্রনায়কেরা। ইতিহাসের শিক্ষাকে উপেক্ষা করা যেন মানুষের স্বভাব। মানব সভ্যতার ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে সাধারণ মানুষের জীবন যাপনের মান।" বোরলগ আরো বলেন — "সামাজিক ন্যায় বিচারের প্রথম পূর্বশর্ত হল সকলের জন্য অন্নসংস্থান।" তিনি আরো বলেন — শান্তি চাইলে ন্যায়বিচারের চাষ করুন। কিন্তু সেই সঙ্গে চাষ করুন ক্ষেত-খামারেও, যাতে বেশি ফসল ফলে। নচেৎ কখনও শান্তি মিলবে না।"

পঁচানব্বই বছর বয়সে নরম্যান বোরলগের প্রয়াণে ২০০৯ সালের (সেপ্টেম্বর) যে ভারতীয় বিজ্ঞানী সবচেয়ে বেশি মর্মাহত, তিনি ডঃ এম এস স্বামীনাথন। ক্যানসারে আক্রান্ত বোরলগকে শেষ দেখা দেখতে যাচ্ছিলেন স্বামীনাথন। পথে ভার্জিনিয়ার ব্ল্যাকসবার্গ শহরে খবর পান বোরলগ আর নেই। আর হল না দেখা।

বোরলগের জন্ম ১৯১৪ সালের ২৫ মার্চ। আমেরিকার আইওয়া প্রদেশের ক্রেসকো শহরের কাছে। মৃত্যু ২০০৯ সেপ্টেম্বর।

বাবা হেনরি এবং মা ক্লারা, দু'জনেই নরওয়ে থেকে আমেরিকায় পাড়ি জমান উদ্বাস্তু হিসাবে। নরম্যানের নেশা ছিল কুস্তি, ফুটবল ও বেসবলেও সমান ওস্তাদ। নরম্যান বোরলগের শিক্ষার পথ মসৃণ হয়নি। অর্থাভাবে মাঝে মাঝে থেমে গিয়েছে পড়াশুনা। আবার কখনও বা ফেলও করেছেন। কিন্তু প্রচণ্ড উদ্যমে শেষ পর্যন্ত সফল হয়েছেন। স্নাতকোত্তর ডিগ্রি এবং পি এইচ ডি করেছেন মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। বন-বিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করলেও খাদ্য শস্য উৎপাদনের বিজ্ঞানে ছিল গভীর আগ্রহ। এবং সেই সঙ্গে সবুজ বিপ্লবের আহ্বান। ১৯৩৫ সালে কয়েক জন বেকার যুবকদের নিয়ে, যাদের অনেকদিন কাটত অনাহারে, কাজ শুরু করেন কৃষি ক্ষেত্রে। ওইসব বেকার যুবকদের সামান্য কিছু রোজগারের সুবাদে বদলে যেত তাদের জীবন; তাই দেখে বোরলগ নিজের ভবিষ্যৎ ঠিক করে ফেলেন। এবং প্রতিজ্ঞা করেন পৃথিবী জুড়ে বাড়াবেন খাদ্যশস্যের উৎপাদন। সেই জন্য যোগাযোগ করেন কৃষিবিজ্ঞানী এলভিন চার্লস স্টকম্যানের সঙ্গে। এলভিনই তাঁকে চেনান শস্য চারা গাছের নানা রোগ, পোকা ও তার প্রতিকার এবং উন্নত মানের বীজ তৈরির ভিন্ন ভিন্ন কৌশল। এর পর ধীরে ধীরে এই কৃষি বিজ্ঞানকে আরো উন্নত করে বোরলগ হন পৃথিবী বিখ্যাত। এবং তাঁর উদ্ভাবিত কৌশলে দেশে দেশে খাদ্য শস্য উৎপাদনে বিপুল অগ্রগতি আসে। আসে সবুজ বিপ্লব।

আমাদের দেশের কৃষি বিজ্ঞানী ডঃ এম এস স্বামীনাথন, বোরলগের সঙ্গে সহযোগী গবেষক রূপে কাজ করে ভারতে আনেন সবুজ বিপ্লব। তাই স্বামীনাথনকে আমরা ভারতের সবুজ বিপ্লবের জনক বলে জানি। বোরলগের অবদানকে স্বীকার করেই ভারত সরকার তাঁকে পদ্মবিভূষণ পুরস্কারে সম্মানিত করেছেন। যদিও বোরলগ-এর শেষ জীবনে এবং ভারতের কৃষি বিজ্ঞানী ডঃ এম এস স্বামীনাথনের উভয়েরই মনে প্রশ্ন জেগেছিল সবুজ বিপ্লবের গতিপথ সঠিক বা যথার্থ হয়েছে কিনা। সবুজ বিপ্লবের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখে পরিবেশবাদীরা আতঙ্কিত। উন্নত চাষের জন্য যে সব কীটনাশক প্রয়োজন তা পরিবেশকে ধ্বংস করছে। রাজস্থান, হরিয়ানা, পাঞ্জাবসহ বিভিন্ন প্রদেশের মাটির নীচে জলস্তর নেমে যাচ্ছে হু হু করে। কারণ চষের কাজে তা খরচ হচ্ছে বিপুল পরিমাণে। ফলে অদূর ভবিষ্যতে ওইসব স্থানগুলি মরুভূমি হয়ে যাবে। তাই ডঃ এম এস স্বামীনাথন পরিস্থিতি দেখে ও বুঝে বলেছেন, "সবুজ বিপ্লব ভুল হয়েছে। এখন নতুন ভাবে ভাবনা চিন্তা করে দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব করতে হবে।"

ডঃ এম এস স্বামীনাথন যে দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের কথা বলেছেন সেটা হবে পরিবেশকে যথাযথ রক্ষা করে এবং পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া শূন্য করে এগিয়ে যাবার জন্য। এখন সেটা বর্তমান কৃষি বিজ্ঞানীদের নতুন নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবনের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু প্রথম সবুজ বিপ্লব যে পথে এবং যে পদ্ধতিতে হয়েছে, সেইপথ ও পদ্ধতি অব্যাহত থাকলে, খাদ্য শস্য যথা ধান, গম, জোয়ার, ভুট্টা, রাগি ইত্যাদি উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে পেতে একটা সময়ে বৃদ্ধির শেষ সীমায় পৌঁছে যাবে;যখন আর বৃদ্ধির হার আর বৃদ্ধি করানো থাকে না। তখনই ওই একই পথে ও পদ্ধতিতে দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব ঘটাতে হলে প্রচলিত খাদ্য শস্য — ধান, গম, জোয়ার, ভুট্টা, রাগি ইত্যাদিকে বাদ দিয়ে ওইগুলির স্থানে আনতে হবে আলুকে;কারণ সবুজ বিপ্লবের মূল লক্ষ্য হল উৎপাদন বাড়ান অর্থাৎ খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা। সেই দিক থেকে বিচার করলে আলুর মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির সুযোগ প্রচলিত খাদ্য শস্যের থেকে অনেক বেশি। আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় প্রফুল্ল সেন ছয়ের দশকে যখন প্রচণ্ড খাদ্যাভাব চলছে তখন বলেছিলেন খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের কথা। তাই দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের মাধ্যমে আলুর উৎপাদন বৃদ্ধি করে আলুর বিভিন্ন পদ সৃষ্টি করে মানুষকে হয়তো খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করতে হতে পারে।

এর পরেও যদি প্রকৃতির রুদ্ররোষে, যথা — খরা, বন্যা, মহামারী, ভূমিকম্প ইত্যাদির মাধ্যমে মানব নামাক প্রজাতিটির অবস্থা বিপন্ন না হয়ে যথাযথ অবস্থায় অবস্থান করে তখন আরো আরো অধিক পরিমাণে খাদ্যে প্রয়োজনে তৃতীয় সবুজ বিপ্লব-এর প্রয়োজন হবে। কারণ তখন আলুও শেষ কথা বলতে পারবে না।

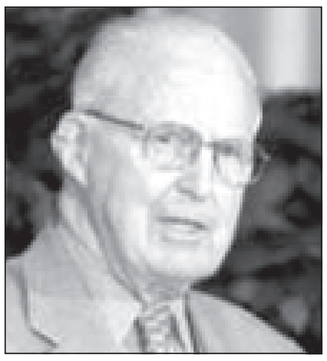

এন এ বোরলগ

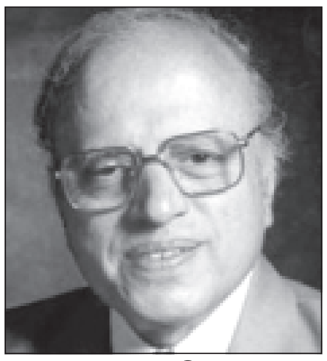

এম এস স্বামীনাথন

ভারত তথা পৃথিবীর জনসংখ্যার চাপ যত বাড়বে ততই কৃষি জমির পরিমাণ কমবে। তাই কৃষি বিজ্ঞানীরাও বিকল্প চিন্তায় অগ্রসর হচ্ছেন। ইতিমধ্যে ভারতসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ব্যক্তিও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিশ্বশান্তির জন্য আদা জল খেয়ে লেগে পড়েছেন। যদি তাঁরা সত্যি সত্যি বিশ্বযুদ্ধ তথা পরমাণু যুদ্ধ লাগতে না দেন তাহলে বিকল্প খাদ্যের কথা ভাবতেই হবে। সেই সময় শস্য ক্ষেত্রগুলি বসত বাড়িতে ভরে যাবে। তাই তখন ছাতু (পোয়াল ছাতু) এবং শ্যাওলাই হবে মানুষের খাদ্যের শেষ উৎস। বিজ্ঞানীরা এমন শ্যাওলার সন্ধান পেয়েছেন যা মাত্র কয়েকদিনে এক কেজি থেকে এক কুইন্টাল হয়ে যেতে পারে। কিন্তু ওই শ্যাওলা সরাসরি খাদ্য হিসাবে ব্যবহারযোগ্য নয়। কিন্তু প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে মানুষের খাদ্যে রূপান্তরিত করা যায়। শুধুমাত্র দেখার বিষয় মানুষের খাদ্যের মূল উপাদানগুলি (যথা — শর্করা, লবণ, ভিটামিন, স্নেহজ পদার্থ, প্রোটিন ও জল) যথাযথ আনুপাতিক হারে বিদ্যমান আছে কিনা। অর্থাৎ সুষম আহার (ব্যালেন্স ডায়েট) হচ্ছে কিনা।

বিজ্ঞানীরা আশা করছেন, সেটা ওই বিশেষ ধরনের শ্যাওলা থেকে অহরণ ওই বিশেষ ধরনের শ্যাওলা থেকে অহরণ করা এবং প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে সম্ভব হবে। তখন সেটাই হবে তৃতীয় সবুজ বিপ্লব। তখন অলক্ষ্যে থেকে বোরলগ হয়তো মৃদু হাঁসবেন। কারণ শুরুটা তিনিই করেছিলেন।

পার্টির ইতিহাসে আজই 'দুঃসময়'

বিশাখা বিশ্বাস

৩১ আগস্ট ১৯৫৯ সাল। এসপ্ল্যানেড ইস্টে গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলের কাছ থেকে কমরেড জ্যোতি বসু এবং মোহিত মৈত্র-কে গাড়িতে তুলে নিল কংগ্রেসের পুলিশ। জ্যোতি বসুর 'স্বাধীনতা' নামক পত্রিকাখানি সেদিন নয় জন নিহত শহীদের ছবি ছাপলো, তেইশ জনের নাম লিখলো কিন্তু মোট নিহতের সংখ্যা ছাপলো উনআশি। মৃত্যুর সেই মিথ্যা ইতিহাস স্বাধীনতার পাতায় আজও অপরিবর্তিত রয়ে গেছে, বদলে গেছে কেবল কাল।

কাল বদলের তালে এল সত্তরের দশকের শেষ সময়। বোলপুরের ডাকবাংলোর জনসভায় বুক পকেট থেকে ভাঁজ করা এক টুকরো কাগজ বের করে জ্যোতি বসু শোনালেন তাঁর দলের সেই এগারোশ কর্মীর লাস হয়ে যাবার ইতিহাস। মৃত্যুর মিথ্যা খবরের ধারাবাহিকতায় তখন জরুরি অবস্থা প্রত্যাহারের আগেকার দিন।

দিন বদলায় কিন্তু মিথ্যা প্রচারের ধারার পরিবর্তন হয় না। অতএব, লালগড়ে সিপিআইএম কর্মীরা শহীদ হল, ধুতি-পাঞ্জাবী পরা এক খর্বকায় বাঙালী কমরেড স্টার আনন্দে জানালেন, সেই আদিবাসী আন্দোলনে যারা শহীদ হয়েছেন তাদের মধ্যে তার পার্টির সদস্য সংখ্যাই হল তিনশ সত্তর। মিথ্যার এই প্রচারের ধারাবাহিকতার দুই দিক ঃ স্বদলীয় শহীদবর্গের মিথ্যা সংখ্যাটা একদিকে যারা নিরবচ্ছিন্ন প্রচারে বাড়িয়ে নিল, হরিহরপুর-মুলুক-নানুর-কেশপুর-গড়বেতা ছোট আঙারিয়ার বধ্যভূমিতে মানুষ মেরে এলো এবং অন্যদিকে সিঙ্গুরে কুমারী কিশোরীর ধর্ষণ শেষে জ্যান্ত মেয়েটোকে যারা পুড়িয়ে মারলো, 'টাটাবাবা'-দের ফেলে যাওয়া চারফসলী জমিতে শকুন চরাতে চরাতে তারাই শেষে বললে মেয়েটার পরিবারের লোকেরই নাকি তাকে মেরেছিল। সিঙ্গুরের চাষীরা সেদিন গান গাইলেন "ও মেঘরে, আমার চোখে জল দেখে বৃষ্টি দাও .... বৃষ্টি দাও।

তা আগুনের বৃষ্টি এল সিঙ্গুরে নয়, এল তা নন্দীগ্রামে। সেই বৃষ্টিতে হাজার হাজার মানুষের ঘর পুড়লো, গ্রাম পুড়লো, হলদি নদীর জলে বোয়ালের পেটে কিষান-বৌয়ের পলাপরা হাত গেল, একবার কথা বলতে তিনবার তোতলানো এক কমরেড গান শোনালেন "ও কমরেড রে, ছল্ করে চল্ যমুনাতে যাই / খল্ হয়ে চল্ সুর্যোদয়-কে সেলাম জানাই। সেলাম জানানো হল, কিন্তু সময় ফুরোবার আগেই আবার এলো সেই রাজারহাট — নীরব জুলুম, সাইলেন্ট সন্ত্রাস, কামাই-য়ের সেই বৈদিক ভিলেজ। পাপের দরবারে তার বাপেরাও যে পার পায় না মোদী-দত্ত-গফ্ফর মোল্লারা তা হাড়ে হাড়ে টের পেলেন, মন্ত্রী রেজ্জাক এবং গৌতমেরা পরস্পর বিরোধী বিবৃতি দিলেন, রাজ্যের শীর্ষ আমলার মুখে ভগবান নতুন নতুন স্বর দিলেন, কিন্তু শুভ্রবেশ পরিহিত রাজ্যের বড় কর্তাটি লোকসভা নির্বাচনের পর সেই যে মৌন হলেন, আজও তিনি মৌনীবাবাই হয়ে রইলেন। সর্বশেষে, শিলিগুড়ির মেয়র নির্বাচনে সিপিআইএম-এর কংগ্রেসকে সমর্থন করে তৃণমূলের জনপ্রিয়তা বর্ধন এবং এমত সময়েই সদ্য ঘুম থেকে উঠে আসা এক শীর্ষ আমলার কণ্ঠে ধ্বনিত হল ঃ বুদ্ধিজীবীরা কারো শত্রু নন, কিন্তু আইন তো আইনের পথেই চলবে।...

তা আইন আইনের পথেই চলুক। কৌশিক, অপর্ণা, শাঁওলী, মহাশ্বেতারা সেই আইনের পথে জেলে গেলে যাক। কিন্তু —

কিন্তু, ওরা কেন কেউ জেলে যাবে না? বছরের পর বছর ধরে কেন্দ্রের বরাদ্দকৃত বিপিএল রেশনের কোটি কোটি টাকা জঙ্গলমহলের মানুষকে না দিয়ে দলীয় নেতা-কর্মী-গুণ্ডা পোষার জন্যে যারা তা খরচ করলো — তারা কেন জেলে যাবে না? তারা কেন জেলে যাবে না যারা কেন্দ্রীয় একশ দিনের কাজের খতিয়ানে হাজার হাজার কোটি টাকায় লালগড়ের আদিবাসীদের জন্য কাজের সৃষ্টি না করে চটি পরা পুলিশী হার্মাদ পোষার জন্যে সেই টাকা ব্যয় করে দিল? কেন জেলের বাইরে আজও রয়ে গেছে তারা — যারা কেন্দ্রের দেওয়া ইন্দিরা আবাস যোজনার আদিবাসী লালগড়বাসীদের গৃহ নির্মাণের কাজে ব্যয় না করে সেই টাকায় দলীয় ক্যাডার কর্মীদের করে খাবার ব্যবস্থা করে দিল? কেন জেলের বাইরে রয়ে গেল সেই সব ঠেঙাড়ে বাহিনীর মানুষেরা — যারা বছরের পর বছর ধরে বঞ্চিত তো নিরন্ন হতদরিদ্র সেইসব আদিবাসী মানুষের স্ব-রোজগারের টাকাগুলো লুট করে নিল? আজও কেন শাস্তি হল না সেইসব উর্দিপরা মস্তানদের লালগড়ের সেই বৃদ্ধ শিক্ষককে যারা নিগৃহীত করলেন? আজও কেন শাস্তি হল না তাদের — কুমারী কন্যাদের কানের রিং টেনে যারা ছিঁড়ে দিল আদিবাসী তরুণীদের কান? কেন আজও শাস্তি হল না তাদের — লালগড়ের উদ্ভিন্ন যৌবনা কুমারীদের বুক টিপে যারা করতে গেছিল উল্লাস মাওবাদী চক্রান্তের ইতিহাস?..

তাই বলছিলাম, আন্দোলনের সু-সময়ে মিথ্যার ধারাবাহিকতায় ১৯৫৯ সনের 'শহীদ'-দের সংখ্যা তেইশকে উনআশি বলে প্রচার করেও, ১৯৭৭-এ সেই সংখ্যাকে ১১০০ করেও এবং আজ এরাজ্যের সেই নাটুকে নটবরের প্রকৃতই 'দুঃসময়'-এ সেই সংখ্যাকে তিনশ সত্তরের মাত্রা দিয়ে প্রচারে কয়েকদিনের জন্যে মোদী- দত্ত-গফফরেরা স্মৃতির আড়ালে গেলেও ইতিহাসের মার থেকে পার পাওয়া যাবে না। কেননা, পার্টির ইতিহাসে আজই প্রকৃত 'দুঃসময়'।

Swastika
26 October - 2009, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registered No. SSRM/Kol. RMS/W.B./RNP - 048/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
L.No. MM&P.O. - SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-021/2007-09

জনজোয়ারে ভাসছে বিশ্বমঙ্গল গো-গ্রাম যাত্রা

উত্তরপ্রদেশের বাদায়ুনে বাইক র‍্যালি।

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। এই প্রতিবেদন লেখার সময় বিশ্বমঙ্গল গো-গ্রাম যাত্রার বিজয়রথ রওনা দিয়েছে অযোধ্যা থেকে। গন্তব্য আপাতত সুলতানপুর। বলা বাহুল্য, রথটি ইতিমধ্যেই রাজস্থান, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, জম্মু ঘুরে এসে ঢুকে পড়েছে উত্তরপ্রদেশে। আর সেইসঙ্গে

ভাষণরত পরমানন্দ সরস্বতী।

পশ্চিমবঙ্গবাসীর অধীর আগ্রহের কাউন্ট-ডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে। মাঝে একটি মাত্র রাজ্য বিহার। সেটি পেরোলেই রাজ্যবাসীর যাবতীয় প্রতীক্ষার অবসান ঘটবে। বিশ্বমঙ্গল গো-গ্রাম যাত্রার রথ ঢুকবে পশ্চিমবঙ্গে। কালীপুজো, ভাইফোঁটার শেষে নতুন উৎসবের আগমনী বার্তায় এ রাজ্যের আকাশে-বাতাসে এখন খুশির হিল্লোল।

শুরুতেই আকাশ-ছোঁয়া সাফল্যের মুখ দেখে ফেলেছে গো-গ্রাম যাত্রা। আক্ষরিক অর্থেই যাত্রাকে কেন্দ্র করে জনজোয়ারে ভেসে গিয়েছে রাজস্থান, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, এমনকী জম্মুও। উত্তরপ্রদেশের রাজধানী লক্ষ্ণৌ থেকে শুরু করে অযোধ্যা — কোথাও জনজোয়ারের খামতি নেই একটুও। গো-গ্রাম যাত্রার গোড়াতেই এই সাফল্যে স্বভাবতই উচ্ছ্বসিত যাত্রার সম্পাদক শঙ্করলাল জানিয়েছেন, ''যাত্রার আয়োজন শুধুমাত্র গো-সম্পদ রক্ষার ব্যাপারে সাধারণ মানুষকে সংগঠিত করানোর জন্যই করা হয়নি, সেইসাথে লক্ষ্য ছিল দেশের সমস্ত মানুষকে জড়ো করে বুঝিয়ে দেওয়া (পড়ুন সরকারকে) হৃত জাতীয় গৌরব পুনরুদ্ধারে ভারতবাসী পিছপা নন। হিসারসহ হরিয়ানার বিভিন্ন এলাকায় স্রেফ মা-বোনেরা নিজেরাই দশ-হাজারেরও বেশি খাবারের প্যাকেট বিলি করেছেন গো-ভক্তদের মধ্যে। যখন যাত্রা পাঞ্জাবে পৌঁছল তখন যেন একটা আবেগের ঢেউ পুরো রাজ্যটাকেই ভাসিয়ে দিয়েছিল। অন্যদিকে নিরাপত্তার দিক দিয়ে যে অঞ্চল সবচেয়ে বেশি স্পর্শকাতর অর্থাৎ জম্মু-- সেখানেও যখন ৬ অক্টোবর যাত্রা পৌঁছল, সেখানকার মানুষও উষ্ণ অভ্যর্থনায় আমাদের বরণ করে নিয়েছিলেন।''

যাত্রা উপলক্ষে বিভিন্ন স্থানে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট বক্তারা। হরিয়ানার সিরসায় শ্রীরাম চ্যারিটেবল পার্কে গত ২ অক্টোবর, গান্ধীজির জন্মদিনে ভাষণ দেবার সময় আর এস এসের অখিল ভারতীয় গ্রাম বিকাশ প্রমুখ ডঃ দীনেশ বলেন, ''এই যাত্রা গান্ধীজীর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করবার একটি প্রচেষ্টা মাত্র। স্বাধীনতার সময় গ্রামে যেখানে নব্বই শতাংশ মানুষ বাস করতেন, এখন সরকারের আত্মঘাতী নীতি এবং কর্মসংস্থানের অভাবে সেখানে বাস করছেন সত্তর শতাংশ মানুষ। সুতরাং এই যাত্রা কৃষি, সমাজ ও অর্থনীতি — এদের গো-ভিত্তিক বিকাশের ক্ষেত্রে আগামীদিনে মাইল-ফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।'' রাজস্থানের গঙ্গানগরে ভাষণ দেবার সময় আর এস এসের অখিল ভারতীয় সেবা প্রমুখ সীতারাম কেদিলাই বলেন, 'বিশ্বমঙ্গল গো-গ্রাম যাত্রার মাধ্যমে ভারতীয় সনাতন সত্যকেই তুলে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে।' অমৃতসরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পশু চিকিৎসক ও সন্ন্যাসী স্বামী পরমানন্দ বলেন, শহর তৈরি হয়েছে গ্রামের উপর ভিত্তি করেই। কিন্তু গো-জাতিকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার কারণে পিছিয়ে পড়েছে গ্রাম। তাই পিছিয়ে পড়ছে শহর। এঁরা ছাড়াও যাত্রাপথে বিভিন্ন জায়গায় বক্তব্য রাখেন সন্ত স্বতন্ত্রপাল সিং, স্বামী অখিলেশ্বরানন্দ, সন্ত চিৎপ্রকাশানন্দ, সন্ত সূর্য প্রতাপ সিং প্রমুখ।

বেরিলি থেকে মথুরা যাওয়ার পথের দৃশ্য।

হরদোই-এ গো-গ্রাম যাত্রা উপলক্ষে আয়োজিত জনসভার একাংশ।

এই বিশ্বমঙ্গল গো-গ্রাম যাত্রার রথ আগামী ২৭ অক্টোবর এসে পৌঁছবে পাটনায়। এর পর দিনতিনেক বিহারের বিভিন্ন জায়গায় পরিক্রমা করে ৩০ অক্টোবর কিষাণগঞ্জ থেকে সকালের দিকেই সোজা ঢুকে পড়বে এ রাজ্যের ফাঁসিদেওয়ায়। এরপর দুপুরে বিশ্রাম নেবে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়িতে, রাতে রথ এসে পৌঁছাবে শিলিগুড়ি। সেখান থেকে পরদিন অর্থাৎ ৩১ অক্টোবর সকালে রওনা দিয়ে খড়িবাড়ি, ঈশ্বরপুর (ইসলামপুর), ডালখোলা প্রভৃতি জায়গা ঘুরে রাতে এসে আশ্রয় নেবে উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জে । ১ নভেম্বরের সকালে রায়গঞ্জ থেকে বেরিয়ে দুপুর নাগাদ রথ পৌঁছবে মালদায়। ওইদিন বিকেলেই রথ ঢুকে পড়বে দক্ষিণবঙ্গের রঘুনাথগঞ্জে। রাতে বিশ্বমঙ্গল গো-গ্রাম যাত্রার রথের অবস্থান মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে। পরের দিন অর্থাৎ ২ নভেম্বর সকালের দিকটাই নদীয়া জেলায় বিশেষ করে বেথুয়াডহরি এবং শান্তিপুরে থাকবে রথের অবস্থান। এরপর বিকেলের দিকে বারাসাত হয়ে সন্ধ্যায় প্রবেশ করার কথা কলকাতায়। ৩ অক্টোবর কলকাতার বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠান হবে। ওইদিন রাতে রথের অবস্থান হাওড়া মহানগর। ৪ঠা নভেম্বর রথযাত্রার প্রায় পুরো দিনটাই কাটিবে বর্ধমান জেলায়। বিকালে কেবল হুগলি জেলার পাণ্ডুয়া, দুপুরে বর্ধমান, বিকেলে দুর্গাপুর হয়ে রাতে রথ পৌঁছবে আসানসোলে। ৫ নভেম্বর পুরুলিয়াতে বিকেলের দিকে থাকবে রথটি। পশ্চিমবঙ্গের রথযাত্রার অবসান ওখানেই। এরপর সন্ধ্যার দিকে জামশেদপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দেবে গো-গ্রাম যাত্রার রথ। পুজো শেষের দুঃখটা হয়ত সেদিনই অনুভব করবেন রাজ্যবাসী।

প্রকাশিত হবে
২ নভেম্বর '০৯

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

বিপ্লবী মদনলাল ধিংড়া-র আত্মবলিদানের শতবর্ষ উপলক্ষে তাঁর বিপ্লবী জীবন, হিন্দুত্বের আদর্শ ও সমকালীন বাংলার বিপ্লব-প্রচেষ্টা নিয়ে মননশীল রচনায় সমৃদ্ধ।

।। নিয়মিত আকারেই প্রকাশিত হবে।। দাম একই থাকছে।।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, দূরভাষ ঃ ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫, e-mail : swastika5915@bsnl.in / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com